রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পরিক্রমা

রবীন্দ্রনাথের হাস্য-পরিহাস

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট • কলিকাতা – ৬

প্রথম প্রকাশ—
ভাদ্র, ১৩৬২
আগষ্ট, ১৯৫৫

৪২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ডি. এম. লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগোপাল দাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ২০-বি
ভুবন সরকার লেন, কলিকাতা-৭ যোগমায়া
প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকার্তিকচন্দ্র
পাল দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র

গ্রন্থকারের নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ শ্রীপ্রতিমা ঠাকুর তাঁর 'নির্বাণ' গ্রন্থে লিখেছেন—'বাবামশায় সকলের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে খুব ভালোবাসতেন। মেয়ে, বউ, পরিবারবর্গের সকলের সঙ্গে, এমন কি নীলমণি ভৃত্যের সঙ্গেও হাস্য-পরিহাসে তাঁর ছিল সহজ আনন্দ।'

নীলমণি শব্দের পাদটীকায় প্রতিমা দেবী লিখেছেন—'কবির ভৃত্য : রহস্যচ্ছলে কবি ডাকতেন নীলমণি বা লীলমণি, প্রকৃত নাম বনমালী।'

এই বনমালীর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টার কথা উল্লেখ করে কবি তাঁর 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'তে নিজেই এক জায়গায় বলেছেন—'বনমালী নামধারী উৎকলবাসী সেবক বৌমার আদেশক্রমে এসেছে।...ওর একটা মস্ত গুণ এই যে, ও ঠাট্টা করলে বুঝতে পারে, ঠিক সময়ে হাসতে জানে। ....আমার আবার স্বভাব এমন যে ঠাট্টা না করলে বাঁচিনে।'

কবির সঙ্গে যাঁরা মিশেছেন, তাঁরাই কবির এই স্বভাবের পরিচয় পেয়েছেন। তাঁর হাসিঠাট্টা বা পরিহাস-রসিকতাগুলি কিরূপ মার্জিত, সুরুচিসম্পন্ন, সূক্ষ্ম ও উচ্চাঙ্গের ছিল, একথাও তাঁরা জানেন। কবির এই কৌতুক-পরিহাসগুলিও তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্পর্শে প্রদীপ্ত হয়ে উঠত।

সাধারণ কথোপকথনের মধ্যেও কবি হাস্য-পরিহাসের সৃষ্টি করতেন। শ্রীসীতা দেবী তাঁর 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থে তাই বলেছেন—'সাধারণ কথাবার্তার ভিতর রঙ ও রস ছড়াইবার ক্ষমতা যতখানি ছিল, এমন কখনও কাহারও মধ্যে দেখি নাই।....কথা যেন আলোক-স্ফুলিঙ্গের মত ঠিকরাইয়া পড়িত। রবীন্দ্রনাথ নিজে গম্ভীরভাবে বলিয়া যাইতেন, শ্রোতারা হাসিয়া আকুল হইত।'

সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে কবি যেসব পরিহাস-রসিকতা করতেন, তার কিছু কিছু কেউ কেউ কোথাও কোথাও লিখেছেন। যেমন—মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে, রাণী চন্দ তাঁর 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত তাঁর 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে, প্রমথ নাথ বিশি তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দ্বীপময় ভারত' গ্রন্থে, সুধীরচন্দ্র কর তাঁর 'কবি-কথা'য় সীতাদেবী তাঁর 'পুণ্যস্মৃতি'তে এবং আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী প্রভৃতি তাঁদের কোন কোন প্রবন্ধে। এছাড়া কবির অসংখ্য হাস্য-পরিহাস তাঁর শ্রোতাদের মুখে মুখে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, প্রবোধচন্দ্র সেন, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ কালিদাস নাগ, কবিশেখর কালিদাস রায়, কবি রাধারাণী দেবী, কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল, বনফুলের কনিষ্ঠভ্রাতা অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির কাছে কবির অনেক হাস্য-পরিহাস আমি শুনেছি।

বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাময়িকপত্র থেকে এবং কবির এইসব শ্রোতাদের মুখ থেকে তাঁর এই অতুলনীয় হাস্য-পরিহাসগুলি আমি সংগ্রহ করেছি। এই হাস্য-পরিহাসগুলি থেকে মানুষ রবীন্দ্রনাথের একটি দিকের পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও অধিক লাভ।'

তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য আস্বাদন করে আমরা যেমন আনন্দ পাই, তেমনি আরও অধিক আনন্দ লাভের জন্য তাঁর ঘটনাবহুল বৈচিত্র্যময় জীবনের একটি একটি অধ্যায়ও আমরা বিশেষভাবে বুঝবার চেষ্টা করব।

কবির অপূর্ব কৌতুক-পরিহাসপ্রিয়তাও তাঁর ব্যক্তি জীবনের একটি দিক। তাঁর ব্যক্তি জীবনের এই দিকটার পরিচয় না পেলে তিনি আমাদের কাছে অনেকখানি অজ্ঞাত থেকে যাবেন। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ১৩৫০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে 'রবীন্দ্র সংলাপ কণিকা' নামক প্রবন্ধে ঠিকই বলেছেন—'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের বিপুল রচনা পড়িয়া তাঁহাকে অনেক জানা যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ জানা যায় না। যিনি তাঁহার সহিত আলাপ-সালাপের সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ না করিয়াছেন, তাঁহার অনেকই অজানা থাকিয়া গিয়াছে। তিনি যে কত কৌতুক-প্রিয় ও সুরসিক ছিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন না। বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাষায় বলা যাইতে পারে, তিনি ছিলেন 'রসিকেন্দ্রচূড়ামণি।' তাঁহার এক পঙক্তি মাত্রও লেখার মধ্যে যেমন কবিত্ব দেখা যায়, তেমনি তাঁহার এক একটি কথাতেও রস নিস্যন্দ ফুটিয়া উঠিত। শ্রোতারা তাহা পান করিয়া মুগ্ধ হইতেন।'

তাই কবিকে সম্যকভাবে বুঝতে হ'লে তিনি যে কিরূপ পরিহাসপ্রিয় মানুষ ছিলেন, এ কথাও আমাদের জানার প্রয়োজন আছে।

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য লাভ করেছি, তাঁদের সকলকেই আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জোড়াসাঁকো নয়—এক সাঁকো

কবি তখন শিলাইদহে পদ্মার উপরে বজরায় বাস করছেন।

চরের গায়ে দুটি বজরা পাশাপাশি বাঁধা। একটিতে কবি নিজে, অপরটিতে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তী। অজিতবাবু পীড়িত হয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় এখানে এসেছেন।

এই সময় কবির আমন্ত্রণে ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একবার শিলাইদহে আসেন।

চারুবাবু এলে অজিতবাবুর বজরায় তাঁর থাকার ব্যবস্থা হ'ল। চারুবাবু অজিতবাবুর বজরায় বিছানাপত্র রেখে কবির বজরায় কবিকে প্রণাম করতে গেলেন।

উভয় বজরায় যাতায়াতের জন্য এক বজরা থেকে অপর বজরা পর্যন্ত একটা তক্তা পাতা ছিল।

চারুবাবু কবিকে প্রণাম করে অজিতবাবুর বজরায় যাবার জন্য উঠলে কবি বললেন—দেখো চারু, তক্তার উপর দিয়ে সাবধানে যেয়ো। মনে রেখো এটা জোড়াসাঁকো নয়—এক সাঁকো।

ফ্র্যেডের ভূত

ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন 'প্রবাসী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক।

চারুবাবু একদিন সন্ধ্যায় কবির সঙ্গে তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে দেখা করতে গেছেন।

চারুবাবু গিয়ে দেখেন, কবির কাছে লোকের পর লোক আসছেন। কেউ এসে নতুন গান শিখে নিচ্ছেন, কেউ তাঁকে দিয়ে কিছু পড়িয়ে শুনছেন, কেউ নানা বাজে কথা পেড়ে বকর বকর করছেন। আর কবি অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে তাঁদের সকলের মন রক্ষা করছেন।

রাত্রি আটটা বেজে গেলে চারুবাবু উঠি উঠি করছেন, এমন সময় এক ভদ্রলোক এলেন। তিনি এসেই কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, ফ্র্যেডের স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার মত কি? আমার তো মনে হয়... ব'লে তিনি অনর্গল বক্তৃতা আরম্ভ করে দিলেন।

কিছুক্ষণ শুনে কবি তাঁকে বললেন—দেখ, তোমার সঙ্গে বুঝি চারুর পরিচয় নেই? ও সম্পাদক মানুষ, ওর সঙ্গে আলাপ করে রাখলে তোমার ফ্র্যেডের কিছু হিল্লে হতে পারে।

সে ভদ্রলোক কবির ব্যঙ্গ বুঝতে পারলেন না। তাই তিনি কেবল একবার 'ও' বলে আবার বকতে লাগলেন। তাঁর বকুনি আর থামে না দেখে রাত্রি প্রায় দশটা নাগাদ চারুবাবু উঠবার উপক্রম করলেন।

চারুবাবুকে চলে যেতে উদ্যত দেখে কবি বললেন—চারু, তুমি চলে যেও না। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে। তুমি আর একটু বোস।

এতক্ষণ পরে সে ভদ্রলোক উঠলেন।

ভদ্রলোক চলে গেলে কবি কুপিতভাবে চারুবাবুকে বললেন—চারু, তোমাকে আমি আমার বন্ধু বলেই এতদিন জানতাম, কিন্তু সে ভ্রম আজ আমার ঘুচে গেল।

চারুবাবু বিস্মিত হয়ে কবির মুখের দিকে চাইতেই কবি হেসে বললেন —তুমি আমাকে ঐ ফ্রুডের ভূতের হাতে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যাচ্ছিলে কোন্ আক্কেলে!

কোথায় কি অন্যায় করলেন, যার জন্য কবি ক্ষুণ্ণ হলেন—চারুবাবু এতক্ষণ তাই ভাবছিলেন। কিন্তু এখন কবির এই কথা শুনে তিনি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

এবার সেই ভদ্রলোক ফ্রয়েড নামকে কি ভাবে যে বারে বারে ফ্রুড্ উচ্চারণ করছিলেন, এই নিয়ে কবি এবং চারুবাবু উভয়েই খুব হাসতে লাগলেন।

রবির গ্রহণ

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনের বিশিষ্ট বন্ধু।

চারুবাবু একবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে ক্ষিতিমোহনবাবুর অতিথি হন। ক্ষিতিমোহনবাবুর বাসায় জিনিসপত্র রেখে চারুবাবু কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন।

চারুবাবু যাওয়ার সময় ক্ষিতিমোহনবাবু তাঁকে বললেন—তুমি যাও, একটু পরে আমিও যাচ্ছি। তারপর দুজনে একসঙ্গে বেড়াতে বেরোব।

কবি এই সময় শান্তিনিকেতনে শালবীথির ধারে মাঠে একখানা তক্তাপোষের উপর একলা বসে ছিলেন।

চারুবাবু গিয়ে কবিকে প্রণাম করে তাঁর কাছে বসলেন।

একটু পরেই ক্ষিতিমোহনবাবুও এসে গেলেন। ক্ষিতিমোহনবাবু এসে চারুবাবুর পাশে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে ক্ষিতিমোহনবাবু চারুবাবুকে বললেন—চারু, চল বেড়াতে যাই।

ক্ষিতিমোহনবাবুর কথা শুনে কবি হেসে বললেন—যখনি চারুচন্দ্র ক্ষিতি আর রবির মাঝখানে পড়েছেন, তখনি জানি যে রবির গ্রহণ লাগবেই।

ক্ষিতিমোহনবাবু এবার চারুবাবুর আশা ত্যাগ করে পালাতে পালাতে বলে গেলেন—না না, আমি চারুকে নিয়ে যেতে চাইনে। ও আপনার কাছেই থাক।

গান ও আবৃত্তি

কবি একবার গয়ায় বেড়াতে যান। সঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও গিয়েছিলেন।

গয়ায় তখন সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় থাকতেন। প্রভাতবাবু এবং আরও কয়েকজন উদ্যোগী হয়ে শহরে একদিন কবিকে সংবর্ধনা জানালেন।

সভায় একজন গান গাইলেন। গায়কের সঙ্গে অপর একজন হারমোনিয়াম বাজালেন। আর একটি কচি মেয়ে একটা কবিতা আবৃত্তি করল। কবিতার প্রথম লাইনটা ছিল—তবু মরিতে হবে।

সভা থেকে ফেরবার পথে গাড়ীতে কবি চারুবাবুকে বললেন—দেখলে চারু আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত! আমি না হয় গোটা কতক গান-কবিতা লিখে অপরাধ করেছি। তাই বলে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে এ রকম যন্ত্রণা দেওয়া কি ভদ্রতা-সঙ্গত। গান হলো, কিন্তু দুজনে প্রাণপণ শক্তিতে পাল্লা দিতে লাগলেন যে, কে কত বেতালা বাজাতে পারেন, আর বেসুরো গাইতে পারেন। গান যায় যদি এ পথে তো বাজনা চলে তার উল্টো পথে। গায়ক-বাদকের এমন স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা আমি আর কস্মিনকালেও দেখিনি। তারপর ঐ একরত্তি কচি মেয়ে, তাকে দিয়ে নাকি সুরে আমাকে শুনিয়ে না দিলেও আমার জানা ছিল যে, তঁবুঁ মরিঁতেঁ হঁবেঁ।

প্রতিপচ্চন্দ্রমা ইব

কবি যেদিন চীন ভ্রমণ করে কলকাতায় ফিরে এলেন, সেদিন স্টিমার ঘাটে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য অনেকের ন্যায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও গিয়েছিলেন।

চারুবাবু তখন অনেকদিন ধরে অসুখে ভুগছিলেন এবং তাঁর শরীরও তখন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কবির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ চারুবাবু তাঁর সেই অসুস্থ শরীর নিয়েও সেদিন স্টিমার ঘাটে গিয়েছিলেন।

কবি ডাঙ্গায় নেমেই চারুবাবুকে দেখে তাঁর পিঠে হাত দিয়ে বললেন—কি চারু, তোমার এমন দশা হ'ল কেন? একেবারে যে প্রতিপচ্চন্দ্রমা ইব।

ক্ষিতি টলা

আকাশে বর্ষার নব মেঘের সঞ্চার হ'লে, প্রথম বসন্তের মলয় বইতে সুরু করলে, ঋতুতে ঋতুতে শান্তিনিকেতনের গাছে গাছে ফুলের সমারোহ প্রথম দেখা দিলে, আশ্রমের ছাত্রছাত্রীরা এইসব উপলক্ষ করে অধ্যাপকদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে ছুটি আদায় করত।

এদিক থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন কিন্তু ক্ষিতিমোহন সেন মশায়। সর্বাধ্যক্ষ হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের এই সব আব্দারে তিনি বড় একটা কান দিতে পারতেন না।

ক্ষিতিমোহনবাবু যে এ সব ব্যাপারে খুব কড়া, এ কথা কবিও জানতেন। তাছাড়া ক্ষিতিমোহনবাবু সে অত্যন্ত স্থির প্রকৃতির মানুষ এও কবি জানতেন।

কবিব নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির সংবাদ যেদিন শান্তিনিকেতনে এল, কবি তখন উত্তবায়ণে।

এই আনন্দ সংবাদ টেলিগ্রামযোগে শান্তিনিকেতনে এলে, কবির পুত্র শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতিমোহন বাবু অধ্যাপক নেপাল রায় এঁরাই আগে পথে পিওনের কাছে জানতে পারেন। পরে আশ্রমেব অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা সকলেই জানতে পারেন।

সংবাদ পেয়েই অধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীরা সকলেই মহানন্দে ছুটলেন কবির কাছে। এমন কি ক্ষিতিমোহনবাবুও।

কবি সমস্ত শুনলেন। তারপর ক্ষিতিমোহনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—ক্ষিতি যখন টলেছে, তখনই বুঝেছি একটা কিছু হয়েছে!

গার্জে́ন

এক সময় উমাচরণ নামে কবির একজন ভৃত্য ছিল। এই উমাচরণ কাজে যেমন ছিল দক্ষ, তেমনি ছিল আমুদে।

কবি এর সঙ্গে মাঝে মাঝে ঠাট্টা-তামাসা করতেন।

উমাচরণ হঠাৎ মারা গেলে, এর পরে যে ভৃত্যটি আসে তার নাম সাধু। সাধু কাজে বেশ পটু হলেও, খুব গম্ভীর প্রকৃতিব মানুষ ছিল। মনিবের সঙ্গে বড একটা কথাবার্তা কইত না। শুধু মেসিনের মত কাজ করে যেত।

ভৃত্য হয়ে এসেছে বলে, সে মনিবের সঙ্গে সাহস করে প্রাণ খুলে কথা কইবে না—কবি এটা আদৌ পছন্দ করতেন না। তাই সাধুর কাজে তিনি খুশি হলেও, তাব গম্ভীব মেজাজ দেখে বড় অস্বস্তি বোধ করতেন।

সাধু আসার কয়েকদিন পরে ক্ষিতিমোহন সেন মশায একদিন কবিকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনার এ ভৃত্যটি কি রকম?

উত্তরে কবি বলেন—আর বলেন কেন মশায়! ওকি আমার ভৃত্য। যা গম্ভীর, মনে হয়, ও আমার গার্জেন। কথাতো শুনতে পাই-ই না। তবে যখন শুনি, গর্জন শুনি।

দাড়িওয়ালা অন্নপূর্ণা

মহাত্মা গান্ধীর আমন্ত্রণে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদে গুজরাট সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে যান। শান্তিনিকেতন থেকে কবির সঙ্গী হন এণ্ড্রুজ সাহেব, সন্তোষ কুমার মজুমদার ও অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন।

যথা সময়ে সাহিত্য সম্মেলনের কাজ মিটে গেলে, কাথিয়া ওয়াড়ের অন্তর্গত ভাবনগরের রাজার আমন্ত্রণে কবি আবার সদলবলে ভাবনগরে গেলেন।

ভাবনগরের পালা শেষ করে কবি সঙ্গীদের নিয়ে পুনরায় আমেদাবাদে ফিরে এলেন। সঙ্গীদের মধ্যে কেবল ক্ষিতিমোহনবাবু একদিন আগে ভাবনগর থেকে আমেদাবাদে ফিরে আসেন। ক্ষিতিমোহনবাবু ফিরে এসে তাঁর আমেদাবাদের বন্ধু ডাহ্যা ভাই পুরোহিতের অতিথি হলেন। ডাহ্যা ভাই পুরোহিত ছিলেন আমেদাবাদের একজন বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী।

পরের দিন কবি বড়োদায় এসে রাজ অতিথি হ'য়ে রাজকীয় 'গেষ্ট হাউসে' উঠলেন। সেখানে চাকর-বাকর-পাচকের দল সব সোনালী-রূপালী তকমায় ভূষিত।

কবি ফিরে এলে ক্ষিতিমোহনবাবু তাঁর বন্ধু ও বন্ধু পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে কবির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

কবি ক্ষিতিমোহনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি গেষ্ট হাউসে উঠেন নি কেন?

ক্ষিতিমোহনবাবু তাঁর বন্ধু-পত্নীটিকে দেখিয়ে বললেন—আমি এর আতিথ্য নিয়েছি।

ক্ষিতিমোহনবাবুর কথা শুনে কবি বললেন—আপনি বেশ ভাগ্যবান। যথার্থ অন্নপূর্ণার সেবাযত্নই আপনি লাভ করছেন। আমার ভাগ্যে জুটেছেন সব দাড়িওয়ালা অন্নপূর্ণা।

কবির এই কথা শুনে শ্রীমতী পুরোহিত কবির সেবায় ও অনেক কাজে সাহায্য করতে প্রবৃত্ত হলেন।

লোভনীয় পানীয়

একদিন সকালে কবি উত্তরায়ণে তাঁর ঘরের বারান্দায় বসে আছেন। এমন সময় অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

ভৃত্য কবিকে একটা গ্লাসে কিসের রস দিয়ে গেলে, কবি একটু একটু করে চুমুক দিয়ে খেতে লাগলেন।

কবি ক্ষিতিমোহনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করলেন, ক্ষিতিমোহনবাবু তাঁর গ্লাসের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন। কবি বুঝলেন—ক্ষিতিমোহনবাবুর এই পানীয়টি নিশ্চয়ই খাবার বড় ইচ্ছে হয়েছে। তাই কবি তাঁর ভৃত্যকে ডেকে ক্ষিতিমোহনবাবুকেও একটুখানি দেবার জন্য ইঙ্গিতে বলে দিলেন।

ভৃত্য একটা গ্লাসে সামান্য একটুখানি ঐ রস এনে ক্ষিতিমোহনবাবুর সামনে টেবিলে রেখে গেল।

কবির গ্লাসে অতখানি, আর তাঁর গ্লাসে মাত্র একটুখানি, এই দেখে ক্ষিতিমোহনবাবু মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণও হলেন। ভাবলেন, হয়তো কোন খুব দামী জিনিস। যাই হোক্, ভৃত্য গ্লাস রেখে গেলে ক্ষিতিমোহনবাবু তো সমস্তটাই একেবারে গলায় ঢেলে দিলেন।

এদিকে ক্ষিতিমোহনবাবু গলায় ঢেলে দিয়ে যান্ আর কি! আদৌ গলাধঃকরণ করতে পারেন না। মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। মহা তিতো, নিমপাতার রস যে!

ক্ষিতিমোহনবাবুর এই অবস্থা দেখে, কবি তখন মৃদু মৃদু হাসছেন।

কবিরাজ

কবি একদিন তাঁর একটি নাট্য রচনায় ব্যস্ত। গান বেঁধে নিজেই সুর দিচ্ছেন। সঙ্গীত-ভবনের কর্মীরা কবির পাশে বসে সঙ্গে সঙ্গে সুর তুলে নিচ্ছেন।

এমন সময় আশ্রমেরই এক ভদ্রলোক এসে এক পাশে দাঁড়ালেন।

কবি তাঁর দিকে চেয়ে বললেন—কি হে, এসে অমন করে দাঁড়ালে কেন?

ভদ্রলোকের শরীর ভাল ছিল না। তিনি শুধু বললেন—আজ্ঞে শরীরটা....

কবি সঙ্গে সঙ্গেই বললেন—বলো, বলো, কি ব্যাপাব। আমি তো শুধু কবিই নয়, কবিরাজও বটে। একটা ওষধ এখনি তোমাব বাত্‌লে দোব।

কবি বায়োকেমিক চিকিৎসা করতেন। সমস্ত শুনে তাকে একটা বায়োকেমিক ওষধ দিলেন।

এখনো হিংসা গেল না

অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং শান্তিনিকেতনের আরও দু-একজন অধ্যাপক একদিন সন্ধ্যার পর কবির কাছে বসেছিলেন।

নানারকমের হাল্কা আলোচনা হচ্ছিল।

এমন সময় কবি হঠাৎ বিধুশেখর শাস্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন—শাস্ত্রী মশায়, আপনি এতদিন বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন, কিন্তু এখনো আপনার হিংসা প্রবৃত্তি গেল না!

এই কথা শুনে শাস্ত্রী মশায় তো অবাক্। ভাবলেন—গুরুদেব হঠাৎ কেন এ কথা বলছেন। কিছুই বুঝতে পারলেন না। আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন।

কবি এবার শাস্ত্রী মশায়ের কামানো গোঁফদাড়ির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন—এদের ছেড়ে দিন। বাড়তে দিন। আর হিংসা করবেন না।

কবির কথা শুনে এবার সকলেই হেসে উঠলেন।

দুগ্ধপোষ্য

শান্তিনিকেতনে তখন গ্রীষ্মাবকাশ।

স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় আশ্রম প্রায় জনহীন।

উত্তরায়ণে কবি নিজে আছেন। আর মাত্র দুচার জন আশ্রমে রয়েছেন—এঁদের মধ্যে অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী একজন।

কবির পুত্র এবং পুত্রবধূও এই সময় ইউরোপে। এঁরা ছাড়াও কবির পরিবারের আর কেউ তখন এখানে না থাকায়, উত্তরায়ণে যে সব গরু ছিল, তাদের দুধ প্রতিদিনই বেশী হয়ে জমে থাকে। খাবার লোক নেই।

কবি একথা যেদিন জানতে পারলেন, সেইদিনই চাকরের হাতে একটা বড় ঘটীতে সের দুই দুধ দিয়ে বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায়ের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। ঐ সঙ্গে ভৃত্যের হাতে একটা ছোট্ট চিঠিও লিখে দিলেন।

ভৃত্য দুধ নিয়ে গিয়ে হাজির হ'লে, শাস্ত্রী মশায় তো আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন—হঠাৎ কেন এত দুধ এল !

এমন সময় ভৃত্য কবির চিঠিখানা দিলে, শাস্ত্রী মশায় পড়তে লাগলেন। কবি লিখেছেন—শাস্ত্রী মশায়, আমি আপনাকে কিছুদিনের জন্য দুগ্ধপোষ্য করতে মনস্থ করেছি।

মাথাটা নীচু করে রাখাই ভাল

কবি বড় বড় ঘর অপেক্ষা ছোট ছোট ঘরেই থাকতে ভালবাসতেন।

তখন তিনি উত্তরায়ণের কোণার্ক বাড়ীতে। এখানেও তিনি একটি ছোট্ট ঘরে বসে কাজ করতেন।

আশ্রমের অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী একদিন কোণার্কে গিয়ে কবিকে দেখতে পেলেন না। এ ঘর সে ঘর দেখতে ছিলেন, এমন সময় ভৃত্য এসে শাস্ত্রী মশায়কে দেখিয়ে দিলেন, কবি কোন্ ঘরে আছেন।

শাস্ত্রী মশায় কবির কাছে গেলে, কবি বললেন—শাস্ত্রী মশায়, এবার আপনারা আমাকে খুঁজে পাবেন না।

উত্তরে শাস্ত্রী মশায় বললেন—রবিকে ঢেকে রাখবে কে? তার প্রকাশই তাকে দেখিয়ে দেবে।

কবি যে কুঠরীতে বসে কাজ করছিলেন, তার ছাদ এত নীচু যে কবি দাড়াইতেই পারতেন না। মাথা ছাদে লেগে যেত।

শাস্ত্রী মশায় কবিকে বললেন—এ ঘরে কিরূপে থাকবেন? মাথা যে ছাদে লেগে যায়?

কবি বললেন মাথাটা নীচু করে রাখাই ভাল।

ঐ সময়েই তো ভাল লাগবার কথা

কবি ইউরোপ ভ্রমণে যাচ্ছেন। সমস্ত প্রস্তুত। বোলপুর স্টেশনে যাত্রার পূর্বে তিনি কোণার্কের পাশের ঘরের বারান্দায় বসে আছেন। তাঁকে বিদায় প্রণাম করবার জন্য আশ্রমের সকলে তখনো উপস্থিত হন নি। একটু দেরি আছে।

অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী একটু আগেই গেছেন। শাস্ত্রী মশায় গিয়ে দেখেন শ্রীভবনের পর্যবেক্ষিকা শ্রীমতী হেমলতা সেন এবং তাঁর ভাইঝি শ্রীমতী অমিতা তাঁরও আগে এসেছেন।

অমিতা দেবীর গানে শক্তি ছিল অসাধারণ। কবি ঐ সময় অমিতা দেবীকে নিজের একটি পুরাতন গানের সুর শিখিয়ে দিচ্ছিলেন। সেই গানটি হচ্ছে—"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসর মত বাসিও।"

গানটি শেষ হলে শাস্ত্রী মশায় কবিকে বললেন—সে অনেক দিনের কথা। আমি তখন কাশীতে পড়ি। তখন আপনার এই গানটি আমি প্রথমে আমার এক বন্ধুর কাছে শুনি। তার সুর ভাল না হলেও গানটি শুনে আমার যে কত ভাল লেগেছিল, তা বলতে পারি না।

কবি শাস্ত্রী মশায়ের তরুণ বয়সের ইঙ্গিত করে হেমলতা সেন ও অমিতা দেবীর সামনেই শাস্ত্রী মশায়কে বললেন ঐ সময়েই তো এ গান আপনার ভাল লাগাবার কথা।

কবির কথা শুনে শাস্ত্রী মশায় নিরুত্তর হলেন।

সেই জন্যই তো আপনাকে দিতে চাইলাম

কবি ইউরোপ ভ্রমণ করে দু এক দিন হ'ল আশ্রমে ফিরে এসেছেন। দুপুরে কোণার্কে একাকী বিশ্রাম করছেন।

কবি সাধারণতঃ দুপুরে ঘুমাতেন না। তাই ঐ সময় তাঁকে নিরিবিলি পাওয়া যাবে ভেবে, অসময় হলেও অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

বিদেশে কত জায়গায় কত আদর অভ্যর্থনা পেয়েছেন, সংক্ষেপে সে সব কথা কবি শাস্ত্রী মশায়কে শোনালেন।

বিদেশে কবিকে অনেকে অনেক জিনিসপত্র উপহার দিয়েছিলেন, সেগুলোর কিছু কিছু ঐ ঘরে তাঁর পাশেই ছিল।

শাস্ত্রী মশায়ের নজর ঐদিকে গেলে ঐগুলি নিয়েই কথাবার্তা হতে লাগল। ঐ সমস্ত জিনিসের মধ্যে একটি অতি সুন্দর ও শোভনীয় জিনিস ছিল।

কবি ঐ জিনিসটি হাতে তুলে নিয়ে শাস্ত্রী মশায়কে বললেন—শাস্ত্রী মশায় এটা আপনি নিন। আপনাকে দিলাম।

শাস্ত্রী মশায় বললেন—এ আমি নিযে কি করব? এ আমাব কোন্ কাজে লাগবে?

কবি হেসে বললেন—আমি জানি আপনি নেবেন না। সেই জন্যই তো আপনাকে দিতে চাইলাম। তা না হলে কি দিতাম!

সরস্বতীর তুলি

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী একদিন কথা-প্রসঙ্গে কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—গুরুদেব, আপনি ছবি আঁকাটা কিরূপে শিখলেন ? আর এত রকমে ?

উত্তরে কবি বলেছিলেন—শুনুন, সরস্বতী প্রথমে আমাকে নিজের লেখনীটি দয়া করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবার পর ভাবলেন—না ! কাজটা সম্পূর্ণ হয়নি, সম্পূর্ণ করতে হবে ! এই ভেবে তিনি নিজের তুলিকাটিও আমাকে প্রদান করলেন।

উত্তর শুনে প্রশ্নকর্তা চমৎকৃত হলেন।

আমিই কেনে কলম কিনি

একবার ইউরোপের কোন একটা জাতি নিজের শত্রুর প্রতি অত্যন্ত নির্দয়ভাবে বোমা ফেলে। এতে ইংরাজরা তখন অত্যন্ত নিন্দা করে।

কিছুদিন পরে দেখা গেল, এই ইংরাজরাই সীমান্ত প্রদেশে প্রচুর বোমা ফেলে লোকের প্রভূত ক্ষতি সাধন করছে।

ঐ সময় একদিন বিকালে পণ্ডিত বিধুশেথর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেন কবির কাছে বসে ইংরাজদের এই বোমা ফেলার কথাই আলোচনা করছিলেন।

শাস্ত্রী মশায় বলছিলেন—সকলেই এইরূপ অপকর্ম করেন. নামটা রটে বিশেষ কোন ব্যক্তির।

ক্ষিতিমোহনবাবু বলে উঠলেন—"সর্বপক্ষী মৎস্যভক্ষী, মৎস্যরাঙ্গা কলঙ্কিণী"। অর্থাৎ সব পাখীই মাছ খায়, মাছ খাওয়ার কলঙ্কটা হয় কেবল মাছরাঙার।

ক্ষিতিমোহনবাবুর কথা শুনে কবি বললেন—কি বললেন, ক্ষিতি-মোহনবাবু, মৎস্যরাঙ্গা কলঙ্কিণী, নয়? থামুন, থামুন, আমি একটা সমস্যা পূরণ করি।

তারপরে বললেন—"সবাই কলম ধার করে নেয়,
আমিই কেনে কলম কিনি!"

বপুর মর্যাদা

অধ্যাপক নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী সেই সবে মাত্র শান্তিনিকেতনে এসে যোগ দিয়েছেন।

এই গোঁসাইজী বেশ একটু স্থূলকায় ছিলেন।

কবি একদিন বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এমন সময় গোঁসাইজীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

কবি গোঁসাইজীর সঙ্গেও কথা বললেন।

গোঁসাইজী শান্তিনিকেতনে নবাগত বলে কবি সৌজন্যবশতঃ তাঁকে আপনি বলে সম্বোধন করছিলেন।

কবির মুখে 'আপনি' শুনে বয়সে অনেক ছোট গোঁসাইজী মনে মনে ভারি সংকোচবোধ করছিলেন। তাই তিনি শেষে অনুনযের স্বরে বললেন —আপনি আমাকে 'আপনি' 'আপনি' বলছেন কেন!

স্মিতহাস্তে কবি উত্তর দিলেন—কি করি বাপু, তোমাব যে বপুখানি, অন্ততঃ তারও তো মর্যাদা দিতে হবে।

নেপালবাবুর দণ্ড

একবার শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকদের এক সভা। সেই সভায় কবিরও উপস্থিত থাকার কথা। উত্তরায়ণের একটি ঘরে সভা বসেছে। সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু কবি তখনও এসে পৌছান নি।

উপস্থিত অধ্যাপকরা গল্প করছেন। সকলেই বেশ প্রফুল্ল। এমন সময় কবি ঘরে ঢুকেই এমন এক গম্ভীরভাব দেখালেন যে, সকলেই যেন শংকিত হয়ে উঠলেন। সকলেই মনে করতে লাগলেন—আজ হয়তো একটা কিছু হয়েছে! কিন্তু কেউই কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেলেন না।

কবি এবার অধ্যাপক নেপাল রায়কে লক্ষ্য করে বললেন—নেপাল-বাবু, আজকাল আপনি কাজে অত্যন্ত ভুল করছেন। অত্যন্ত গর্হিত। এজন্য আপনাকে দণ্ড নিতে হবে।

এই কথা শুনে অধ্যাপকরা সকলেই আরো চিন্তিত ও শংকিত হয়ে উঠলেন। একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। কেউ কোন কথা বলতে পারলেন না। আর নেপালবাবু তো ভয়ে যেন একেবারে কাঁটা হয়ে উঠলেন।

অধ্যাপকদের যখন এইরূপ অবস্থা, কবি তখন নেপালবাবুকে ভৎসনা করতে করতেই ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের একটা ঘরে গেলেন।

সেই ঘর থেকে একটা লাঠি এনে, নেপালবাবুর হাতে দিয়ে কবি বললেন—নেপালবাবু, কাল আপনি সন্ধ্যার সময় ভুলে এই লাঠিখানি এখানে ফেলে গিয়েছিলেন, এই নিন্।

কবির এই কথা শুনে অধ্যাপকরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

জগদানন্দবাবুর বানান

জগদানন্দ রায় সেই সবেমাত্র বি. এ. পাস করে ঠাকুর এস্টেটে জমিদারী সেরেস্তায় গোমস্তার কাজ নিয়েছেন। সামান্য তিরিশ টাকা মাইনে। তাই তিনি নিজেই রান্না করে খান।

এই গোমস্তার কাজ করে জগদানন্দবাবুর পেটের ক্ষুধা কোন রকমে মিটলেও মনের ক্ষুধা কিন্তু আদৌ মিট্‌ত না। তবে তাঁর একমাত্র আকর্ষণ ছিল, কবির জন্য আসা বিজ্ঞানের পত্রিকাগুলি।

কবি এই সময় জমিদারী এস্টেট দেখাশোনা করতেন। একদিন জগদানন্দবাবুর তলব পড়ল খোদ কবির কাছ থেকে।

জগদানন্দবাবু তো শংকিতচিত্তেই কবির কাছে গেলেন। গিয়ে দেখলেন—বৈঠকখানা ঘরে কবি একা বসে আছেন। মুখ অত্যন্ত গম্ভীর।

কবি জগদানন্দবাবুকে বসতে বললে, জগদানন্দবাবু তো ভয়ে ভয়ে এক ধারে বসলেন।

এবার কবি বললেন—দেখুন জগদানন্দবাবু, আপনাকে দিয়ে জমিদারীর কাজ চলবে না দেখছি। এর আগে কখনো জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করেছিলেন কি ?

জগদানন্দবাবু ভয়ে ভয়েই উত্তর দিলেন—আজ্ঞে না।

কবি বললেন—এমন কি খাতা লিখতেও আপনি জানেন না। কোন্ সাহসে আপনি চাকরীতে ঢুকলেন? এখানে কে বহাল করল আপনাকে ?

কবির কথা শুনে জগদানন্দবাবুর তো অত্যন্ত ভয় হয়ে গেল। ভাবলেন—তাই তো এমন কি অপরাধ করলাম, যে জন্য কবি এত অসন্তুষ্ট হলেন!

কিন্তু সব ছাপিয়ে জগদানন্দবাবুর বারে বারে মনে হচ্ছিল, চাকরীটা যদি যায়, তাহলে কি দশা হবে! ভাবলেন—মাসান্তে যে পনর কুড়ি টাকা পাঠাই, তাও বুঝি বা বন্ধ হ'ল। এই ভেবে জগদানন্দবাবুর চোখে প্রায় জল আসবার উপক্রম হ'ল।

কবি তেমনি গম্ভীরভাবেই আবার বলে যেতে লাগলেন—দেখুন, আজ সাত-পুরুষ ধরে এই জমিদারীর খাতায় পিতা বানান লেখা হয় প-য়ে দীর্ঘ-ই করে। আপনি এসেই তাকে বদলে লিখলেন কিনা প-য়ে হ্রস্ব-ই। তারপর চিরদিন লেখা হচ্ছে 'গৃহিতা', আপনি এসে লিখলেন 'গ্রহীতা'। কাজেই আপনাকে দিয়ে জমিদারীর কাজ হওয়া অসম্ভব। তাছাড়া না বলে পরের জিনিস নেওয়ার অভ্যাসটা ভাল নয়। সেটাও আপনার আছে।

এই শুনে জগদানন্দবাবুর অবস্থা তো চরমে পৌছল। তাঁর অবস্থা এমন হ'ল যে, তাঁর লেখা বানান দুটি যে ঠিক, তাও তিনি বলতে পারলেন না।

কবি বলে যেতে লাগলেন—কাজেই জমিদারী সেরেস্তার কাজে আপনার জবাব হয়ে গেল। এক মাসের মাইনে অবশ্য আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে। আর সত্যিই আপনি এ কাজের একেবারে অনুপযুক্ত। শুনি, আপনি নাকি দিন রাত্তির বই পড়েন। তা আপনার মন যদি পড়ায় থাকে, তাহলে এ কাজ আপনি করবেন কি করে? আর আমিও দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্য করে দেখছি, আমার নামে যে সব বৈজ্ঞানিক কাগজ-পত্র আসে তা সবই প্রথমে দুচার দিনের জন্য অন্তর্ধান হয়ে যায় এবং তা হয় আপনার দ্বারাই। বলুন সত্যি কিনা?

জগদানন্দবাবু এবার লজ্জিত হয়ে অপরাধ স্বীকার করেন এবং বলেন—এবারের মত আমায় ক্ষমা করুন। আর কখনো এ রকম দোষ করব না। বিশ্বাস করুন, চাকরীটুকু গেলে আমার সংসার একেবারে অচল হয়ে যাবে। না খেয়ে মরতে হ'বে।

কবি গম্ভীরস্বরে বললেন—তাহলে কি বলেন, আপনার ভুলের জন্ম আপনার খাওয়ার ভার আমাকেই নিতে হবে। বেশ, কাল থেকে তবে আমার সঙ্গেই খাবেন।

জগদানন্দবাবু ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। কোন কথাই আর বলতে সাহস করলেন না।

কবি এবার হেসে বললেন—হঁ্যা, হঁ্যা, সত্যিই আপনি কাল থেকে আমার সঙ্গে খাবেন। আপনাকে জমিদারীর কাজ আর করতে হবে না। আপনি আমার ছেলে রথীকে এখন থেকে পড়াবেন। মাইনে হ'ল পঞ্চাশ টাকা। রথীকে প-য়ে দীর্ঘ-ইকার দিয়ে পিতা বানান শেখানো আমি চাই না। হঁ্যা, আর একটি কাজ আপনাকে করতে হবে—ঠিক ছোট ছেলেদের উপযোগী করে বিজ্ঞানের বিষয় লিখতে সুরু করে দিন। আমার সমস্ত লাইব্রেরী খোলা রইল, আপনার জন্য। তাছাড়া যখন যা বই দরকার পড়বে, আমায় জানালেই পাবেন।

অতিরিক্ত আনন্দ হ'লে অনেক সময়ে মানুষের কথা বলবার ক্ষমতা যে লোপ পেয়ে যায়, কবির এই কথাগুলো শুনে জগদানন্দবাবুরও ঠিক সেই দশা হ'ল। অনেক কষ্টে শক্তি সংগ্রহ করে তিনি শুধু বললেন—কিন্তু লিখতে আমি ঠিক মতো পারব কি?

কবি হেসে বললেন—ভয় হচ্ছে বুঝি, বানান ভুল হবার? না, না ঐ বানানেই চলবে। লিখুন, আমি দেখে দোব অখন, ভয় কি?

অচলায়তন

চুঁচুড়ায় একবার এক সাহিত্য সম্মেলন হয়।

সেই সাহিত্য সম্মেলনে একজন স্থানীয় বক্তা চুঁচুড়ার রক্ষণশীলতা প্রমাণ করবার জন্য বক্তৃতার ভিতর বলেছিলেন—কেশবচন্দ্র সেন এখানে ১২২ বার এসেছিলেন, কিন্তু তিনি চুঁচুড়ার একজনকেও ব্রাহ্ম করতে পারেন নি।

এই সাহিত্য সম্মেলনের অল্পদিন পরেই কে একজন ঐ কথাটা কবিকে শোনান।

কবি শুনে হেসে বলেছিলেন—১২২ বার! তবু একজনও ব্রাহ্ম হ'ল না! এ যে দেখি একেবারে অচলায়তন হে!

পদসেবা

শান্তিনিকেতনে তখন খুব মশা ছিল। তাই সন্ধ্যার সময় কবি যখন বসে কাজকর্ম করতেন বা লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি 'মস্‌কুইটল' নামে একটা তেল পায়ে মাখতেন। তার ফলে মশা আর পায়ে বসতে পারত না।

তেলটার নেবু ফুলের মত একটা গন্ধ ছিল। কবির হাতেব কাছেই একটা শিশিতে এই তেল থাকত। কবি তা থেকে অল্প করে হাতে ঢেলে নিয়ে পায়ে মাখতেন।

এই সময় তাঁর কাছে নবাগত কোন পুরুষ বা মহিলা উপস্থিত থাকলে, তিনি বলতেন—ভেবো না যে, আমি বুড়ো মানুষ বাত হয়েছে বলে পায়ে তেল মালিশ করছি। এ মশার ভয়ে। শান্তিনিকেতনের মশারা ভারি নম্র। তারা সাবাক্ষণই পদসেবা করে। কাজেই এই উপায় অবলম্বন করেছি।

আয়তনে চেনা

শান্তিনিকেতনের ৭ই পৌষের উৎসবে যোগ দেবার জন্য কবির বিশেষ পরিচিত এক ভদ্রমহিলা একবার শান্তিনিকেতনে যান। শান্তিনিকেতনে গিয়ে তিনি কবিকে প্রণাম করতে গেলেন।

এই সময়টায় কিছুদিন থেকে কবির দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল এবং তিনি কানেও ভাল শুনতে পেতেন না।

ভদ্রমহিলা উত্তরায়ণে গিয়ে কবিকে প্রণাম করলে, কবি তাঁর মুখের দিকে চইলেন।

ভদ্রমহিলা ভাবলেন, অনেকদিন পরে তিনি এসেছেন বলে কবি হয়তো তাঁকে চিনতে পারছেন না। তাই তিনি কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমাকে চিনতে পারছেন তো?

কণ্ঠস্বরেই চিনলেও কবি কিন্তু পরিহাস করে বললেন—আয়তনে চিনেছি।

কবির কথা শুনে ভদ্রমহিলা আর কোন কথা বলতে পারলেন না। শুধু বললেন—আমার চেয়ে বিপুল আয়তনের মানুষ তো অনেকগুলিই আপনার এখানে দেখলাম।

তোপ পড়ল

শান্তিনিকেতনের কয়েকজন অধ্যাপক, ছাত্র ও ছাত্রীবৃন্দ এবং আশ্রমবাসীও জন কতক একদিন বিকালে শান্তিনিকেতন থেকে পারুল বনে বেড়াতে যান। কবিও গেলেন।

সেদিনটা ছিল পূর্ণিমা। সন্ধ্যা হ'তেই জোছনায় যেন বান ডেকে গেল।

একটা খোলা জায়গায় সভা বসল। কবি নিজে বহু গান গাইলেন। ক্ষিতিমোহন সেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরুন্ধতী সরকার (অধুনা চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতিও গান করলেন। এইভাবে রাত্রি ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে আশ্রমে ফেরবার জন্য সকলেই উঠলেন।

যাবার সময় যেমন হয়েছিল, ফেরার সময়ও তেমনি সকলে একসঙ্গে না এসে কয়েকটা দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন।

কয়েকটি মেয়ে কবির সঙ্গ ছাড়ল না। তারা কবির সঙ্গেই আসতে লাগল।

মাঠের ভিতর দিয়ে ফেরার সময় হঠাৎ 'গুম্' করে একটা শব্দ হ'ল।

একটি মেয়ে কিসের শব্দ জিজ্ঞাসা করায়, কবি গম্ভীরভাবে বললেন—সাড়ে ন'টার তোপ্ পড়ল!

আর একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করল—তোপ্ কোথায় পড়ল?

কবি তেমনি গম্ভীর ভাবেই বললেন—ফোর্ট উইলিয়মে।

কবির কথা সত্য ভেবে দু তিনটি মেয়ে তাদের ঘড়িও মিলিয়ে নিল।

পরে তারা কবিকে হাসতে দেখে নিজেদের ভুল বুঝতে পারল।

ছাত্রদের খাওয়া

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম দিকে অনেক বছর পর্যন্ত ছাত্ররা মাঝে মাঝে এক এক দল এসে কবির বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেয়ে যেত।

সেদিন এক দলের নিমন্ত্রণ খাবার পালা।

তারা এসে কবির পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর কাছে কজন খাবে তার একটা তালিকা দিয়ে গেল।

ঐ সময় প্রতিমা দেবীর ঘরে মহিলা ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্তা সীতা দেবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি কদিন শান্তিনিকেতনে থেকে ঐ দিন বাড়ী ফিরবেন বলে প্রতিমা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

ছেলেরা চলে যেতেই কবি এসে ছেলেদের খাওয়া নিয়ে পুত্রবধূর সঙ্গে দু-একটা কথা বললেন। তারপর সীতা দেবীকে লক্ষ্য করে বললেন—আজই তোমাদের যাওয়া কি ঠিক?

সীতা দেবী উত্তরে বললেন—হ্যাঁ।

কবি তখন বললেন—আমার ছেলেদের খাওয়াটা দেখে গেলে না? তাদের পড়ার চেয়ে খাওয়াটাই বেশী দেখবার জিনিস! এক একজন যে রকম খাবে বলে গেছে, সে একেবারে ভয়ানক! আমি অবিশ্যি তাদের অত খেতে দেব না। এখান থেকে উঠেই যে হাসপাতালে গিয়ে ঢুকবে, তা হচ্ছে না।

রচনা বলি

বিশ্বভারতীর গ্রন্থসচিব শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মশায় কবির "রচনাবলী" প্রকাশে তখন উদ্যোগী হয়েছেন। 'সন্ধ্যা-সংগীতের' পূর্বেকার রচনা এবং আরো অনেক রচনাংশ—কবি যা কাঁচা রচনা হিসাবে বাদ দিয়ে রেখেছিলেন, চারুবাবু রচনাবলীতে সে সবই ছাপাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। চারুবাবু ভাবলেন, ঐতিহাসিক সূত্র-স্বরূপ এবং সাহিত্যিক মূল্যে সার্থক রচনা হিসাবে তার অনেকগুলোর ক্রম রক্ষা করা হবে।

কবি কিন্তু এর বিরোধী হলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি চারুবাবুর আগ্রহ এবং যৌক্তিকতার কাছে নিরস্ত হলেন।

ইতিহাস কবিকে ছাড়ল না। দুখণ্ডে অচলিত সংগ্রহ "রচনাবলীর" অংশ হয়ে প্রকাশিত হ'ল।

এই রচনাবলী প্রকাশিত হলে কবি প্রায়ই পরিহাস করে বলতেন—রচনাবলী তো নয় ও হচ্ছে রচনা বলি।

চাঁদে ঢাকা দেওয়া

কবির ভৃত্য মহাদেব শীতকালে কবির শোবার ঘরের পাশের ঘরে, আর গ্রীষ্মকালে কবির ঘরের বাইরের বারান্দায় শুতো।

একদিন গ্রীষ্মকালে কবি বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন। জোছনা এসে মুখে পড়েছে। হঠাৎ কবির ঘুম ভেঙ্গে গেল।

মহাদেবকে ডেকে কবি বললেন—ওরে চাঁদটা ঢেকে দেতো। ঘুম হচ্ছে না।

দূরে আকাশে চাঁদ। মহাদেব তো ভেবেই পেল না, চাঁদকে কেমন করে সে ঢেকে দেবে। বেচারা দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোতে লাগল।

কবি হেসে বললেন—পারছিস্ নে। আচ্ছা এক কাজ কর। ঐ জানালাটা বন্ধ করে দেতো।

মহাদেব তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করতেই ঘর অন্ধকার হ'ল।

কবি বললেন—কিরে হ'ল এবার? চাঁদ ঢাকা পড়ল?

পান্তুয়া

কবির অত্যন্ত স্নেহভাজন এবং পারিবারিক হৃদ্যতার দিক দিয়েও খুব ঘনিষ্ঠ, এমন এক ডাক্তার ভদ্রলোক বাইরে থেকে প্রায়ই 'উদয়নে' আসা-যাওয়া করতেন। আতিথ্যের সব দিক দিয়ে দেখাশোনা করা কবির পক্ষে সব সময়ে হয়ে উঠত না! তবে মাঝে মাঝে তিনি তাঁর চায়ের টেবিলে এই ডাক্তার ভদ্রলোককে নিয়ে বসতেন।

ভদ্রলোক ছিলেন একটু মিষ্টান্ন-প্রিয় এবং খেতেও পারতেন। কবি এ কথা জানতেন। তাই কবি একদিন চায়ের টেবিলে তাঁকে নিয়ে বসে বললেন—তুমি পান্তুয়া ক'টা খেতে পার।

ভদ্রলোক ডাক্তার মানুষ। সতর্কতার সঙ্গে মাথা চুলকে বললেন—লোকে আর কটাই বা খায়। দু চারটা যা হয়।

এবার কবির নির্দেশে ভদ্রলোকের প্লেটে বড় বড় পান্তুযা এসে পড়তে লাগল। শান্তিনিকেতনের পান্তুয়ার একটু খ্যাতিও ছিল।

ভদ্রলোক আর কত খাবেন। থামলেন।

কবি খুব খুশি। মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, পান্তুয়া তো খেলে, এবার বলতো এগুলো কিসের তৈরি ?

ভদ্রলোক কতকটা বিস্মিত হয়ে বললেন—কেন ? যা দিয়ে পান্তুযা তৈরি হয়, ছানার !

কবি তেমনি হাসতে হাসতেই বললেন—কেমন ঠকালাম ! বলতে তো পারলে না। ওগুলো ওলের তৈরি।

ওলের তৈরি অমন পান্তুয়া খেয়ে ডাক্তার তো থ বনে গেলেন।

আহারেণ ধনঞ্জয়

কয়েকজন সাহিত্যিককে কবি একবার তাঁর বাড়ীতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে অতিথিদের মধ্যে একজন তো এখন অত্যন্ত গুরুভোজন করে বসলেন। ফলে তাঁর দেহ শিথিল এবং চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে এল। আর তাঁর চলবার সামর্থ্যও প্রায় হারাবার অবস্থা হ'ল।

ভোজনকক্ষ ত্যাগ করবার সময় তাঁর ভাব দেখে কবি বললেন—কি হে, তোমার একি হ'ল? আহারেণ ধনঞ্জয়ের কথা কই তো শাস্ত্রে কোথাও পড়িনি!

কবির কথা শুনে সকলেই হো হো করে হেসে উঠলেন। এমন কি সেই গুরুভোজনকারীও হাসিতে যোগ না দিয়ে থাকতে পারলেন না।

শুধু কাসি শুনেছি

কবি পঞ্চাশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করলে, দেশবাসী তাঁর শুভ শতায়ু প্রার্থনা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য তখন এক মহতী সভার অনুষ্ঠান করেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন বাগ্চী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন এই সংবর্ধনা সভার মূলে ছিলেন এবং এজন্য অর্থ সংগ্রহাদি ব্যাপারে এঁরা যথেষ্ট পরিশ্রমও করেছিলেন।

কবির প্রতি এই শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের সভার কয়েকদিন পরে, কবি সভার মূল উদ্যোক্তাদের একদিন তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন।

সেদিন নিমন্ত্রণ সভায় নির্দিষ্ট সময়ে সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। কেবল যতীন্দ্রমোহন বাগ্চীই তখনো আসেন নি।

দোতলার একটি কক্ষে সভা বসেছে। কবি গান আরম্ভ করলেন।

"এখনও তারে চোখে দেখিনি, শুধু কাসি শুনেছি" কবির এই কলিটা গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যতীনবাবু ঘরে এসে ঢুকলেন।

যতীনবাবুকে দেখে কবির গানের শ্রোতারা সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন।

যতীনবাবু কিছু বুঝতে না পেরে বিস্মিত হয়ে সকলের দিকে চেয়ে রইলেন।

যতীনবাবুর বিস্মিত চোখে জিজ্ঞাসুভাব দেখে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবার বললেন—সিঁড়িতে তোমার কাসির শব্দ শুনেই গুরুদেব তোমাকে চিনেছেন। তাই গানের কলিতে 'বাঁশির' স্থানে 'কাসি' এসেছে।

কথা শুনে যতীনবাবু তো অবাক।

দেহরঞ্জনেও ওস্তাদ

একবার এক দোলপূর্ণিমার দিনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দেখা হয়।

পরস্পর নমস্কার বিনিময় হয়ে গেলে, দ্বিজেন্দ্রলাল হঠাৎ জামার পকেট থেকে আবীর নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বেশ করে আবীরে রঞ্জিত করে দিলেন।

আবীর-রঞ্জিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন—আপনার এ এক নতুন পরিচয় বটে। এতদিন জানতাম দ্বিজেন্দ্রবাবু 'হাসির গান' লিখে সকলের মনোরঞ্জনই করে থাকেন। আজ দেখছি শুধু মনোরঞ্জনই নয়, দেহরঞ্জনেও তিনি একজন ওস্তাদ।

পিতৃ-আজ্ঞা

একবার একটি তরুণ-বয়স্ক ভদ্রলোক শান্তিনিকেতনে কবির সঙ্গে দেখা করতে যান।

ভদ্রলোকের সেই বয়সেই মাথায় এক প্রকাণ্ড টাক পড়েছিল।

ভদ্রলোক গেলে কথাবার্তার পর কবি তাঁকে বললেন—কি হে, এই বয়সেই যে বেশ টাকমণ্ডল রচনা করেছ!

ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে বললেন—আজ্ঞে, আমার পিতৃদেবেরও অল্প বয়সে চুল উঠে গিয়েছিল শুনেছি।

কবি শুনে গম্ভীরভাবে বললেন—ও! পিতৃ-আজ্ঞা বলে শিরোধার্য করে নিয়েছ! ভালো।

পাদুকা-পুরাণ

রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আর্ট ও সাহিত্যের আসর 'বিচিত্রার' অধিবেশন তখন প্রতি সপ্তাহেই হ'ত। কলকাতার নামকরা সাহিত্যিক ও শিল্পীরা প্রায় সকলেই এই আসরে আসতেন।

ঘরের মেঝেয় ঢালা ফরাসের উপর সভা বসত। তাই সকলেই ঘরের বাইরে জুতো খুলে ফরাসে এসে বসতেন।

সভা ভঙ্গের পর প্রত্যেকবারই খবর পাওয়া যেত কারও না কারও জুতো হারিয়েছে। এইভাবে প্রতিবারেই দু-একজনের করে জুতো হারাতে থাকলে সকলেই জুতো-সমস্যায় পড়লেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তো ছেঁড়া জুতোই পায়ে দিয়ে আসতে আরম্ভ করলেন।

সেবার 'বিচিত্রা'র এক বিশেষ অধিবেশনে শরৎচন্দ্রও এসেছেন। শরৎচন্দ্র এসেই কয়েকজনের মুখে সভায় জুতো চুরির কাহিনী শুনলেন।

শরৎচন্দ্র সেদিন তাঁর সখের নতুন জুতো জোড়াটি পায়ে দিয়ে এসেছেন। তাই জুতো চুরির কথা শুনে, তিনি বারান্দার একদিকে গিয়ে তাঁর হাতে যে খবরের কাগজটা ছিল, তাই দিয়েই জুতো জোড়াটি মুড়লেন। তারপর মোড়কটি হাতে নিয়ে সভায় রবীন্দ্রনাথের সামনে এসে বসলেন।

শরৎচন্দ্র যখন কাগজে জুতো মোড়েন, সত্যেন দত্ত দূর থেকে তা দেখে ছিলেন। তিনি চুপে চুপে রবীন্দ্রনাথকে বলে দেন যে, শরৎচন্দ্রের হাতে কাগজের মোড়কের মধ্যে তাঁর জুতো রয়েছে।

এই শুনে রবীন্দ্রনাথ সভায় বসে এক সময়ে শরৎচন্দ্রের হাতের মোড়কটির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন—শরৎ এটা কি ?

শরৎচন্দ্র একটু ইতস্তত: করে বললেন—আজ্ঞে, আছে একটা জিনিস।

রবীন্দ্রনাথ আবার প্রশ্ন করেন—কি জিনিস শরৎ ? বই-টই নাকি ?

শরৎচন্দ্র মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন—আজ্ঞে···

রবীন্দ্রনাথ এবার সকৌতুকে বললেন—কি বই শরৎ, পাদুকা-পুরাণ বুঝি ?

রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে শরৎচন্দ্র তো অবাক্ !

অপর সকলে কিন্তু হো-হো করে তখন হাসছেন।

চোখের জল

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস তখন।

কবি এই সময়টায় চোখ নিয়ে বড় ভাবনায় পড়েছিলেন। থেকে থেকে চশমা বদলাচ্ছিলেন এবং নানা রকম ওষুধও লাগাচ্ছিলেন।

একটা ওষুধ তখন রোজ ড্রপার দিয়ে দিনে তিন চার বার করে চোখে লাগাতে হ'ত। কবির সেক্রেটারী অনিলকুমার চন্দের স্ত্রী রাণী চন্দ ওষুধটা ড্রপার দিয়ে কবির চোখে দিতেন।

ওষুধটার খুব ঝাঁজ ছিল এবং চোখে দিলে কিছুক্ষণ বেশ জ্বালাও করত। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ দিয়ে জল ঝরত। তাই রাণী দেবী ওষুধ হাতে নিয়ে কবির কাছে গেলেই কবি বলে উঠতেন—এসেছ তুমি আমার অশ্রুপাত করাতে! আমার চোখের জল ফেলিয়ে তুমি কি সুখটা পাও বলো দেখি! দেখ, চক্ষুদাত্রী, ইতিহাসে তুমি অমর হয়ে থাকবে। যখন কেউ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী লিখবে, তখন তাকে বোলো যে, রবীন্দ্রনাথের চোখের জল একজনই শুধু ফেলাতে পেরেছে, সে হচ্ছে তুমিই। বাপ্ রে কি জলটাই ঝরাচ্ছ তুমি দিনে তিন চার করে!

সারপ্রাইজ

কবির প্রাতরাশের টেবিলের পাশে সেদিন তাঁর সেক্রেটারী অনিল কুমার চন্দ ও অনিলবাবুর স্ত্রী রাণী চন্দ এসে দাঁড়ালেন।

প্রাতরাশ শেষ হলে, অনিলবাবু কবির একটি ফটো টেবিলের উপর রাখলেন। কে একজন তাতে কবির সই নেবার জন্য সেটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ফটোখানায় কবির মুখে আলো-ছায়াতে বেশ একটা ভাব ফুটে ঠেছিল।

কবি ফটোখানা হাতে নিয়ে রাণী দেবীকে দেখিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন—আমার এই ফটোটায় ওরা কেউ কেউ বলে রোদ্দুর পড়ে এমনি হয়েছে। তাই কি! আমি বলি, ও আমার জ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। একি আর সবার ছবিতে হয়! হবে কি তোমার ফটোতে?—এই বলে কবি হেসে অনিলবাবুর দিকে কটাক্ষপাত করলেন।

অনিলবাবু গর্বের সঙ্গে বললেন—জানেন, আমার ফটো তুলে শম্ভুবাবু বিদেশে কম্পিটিশনে প্রাইজ পেয়েছেন।

অনিলবাবুর কথা শুনে কবি মুখে একটু বিস্ময়ের ভাব এনে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—বটে! এটা প্রাইজ (Prize) না হোক্, আমার কাছে সারপ্রাইজ (Surprise) তো বটেই।

পা

কবির বয়স তখন প্রায় আশি। বার্ধক্যের জন্য তাঁর পায়ের জোর কমে এসেছে। হাঁটতে কষ্ট পান।

সেই সময় কবি একদিন তাঁর পায়ের কথা প্রসঙ্গে রাণী চন্দকে বলেছিলেন—নাচটা আমার এ জন্মে আর হ'ল না! মা যদি আমার ছেলে বয়সে এই তোমার ছেলের মতন আমায় একটু আধটু নাচাতেন, তাহলে বয়সকালে নাচ কাকে বলে তোমাদের দেখিয়ে দিতাম। এখন পা দুটোই যে অচল। তারা অনেক আগে থেকেই ধর্মঘট করে বসে আছে, বলে আমাদের দিকে তো কোনদিন চাইলে না, হাত নিয়েই তুমি খেলা করেছ। তাই দেখ না, আজকাল নিজের পায়ে দিতে কত তেল খরচ করছি। তবে তো তারা একটু আধটু মুখ তুলে চাইছে মাঝে মাঝে।

পায়ের মাধুর্য

কবির বয়স তখন একাশি। বার্ধক্যের জন্য একা চলাফেরা করতে, উঠতে হাঁটতে একটু কষ্ট বোধ করেন।

কবি বারান্দায় বসে একদিন মুখে মুখে গল্প বলে যাচ্ছিলেন। পাশে বসে রাণী চন্দ তা লিখে নিচ্ছিলেন।

খানিক বাদে কবিকে বারান্দা থেকে ঘরে নেবার সময়ে জুতো পরাতে গিয়ে রাণী দেবী দেখেন যে, কয়েকটা লাল পিঁপড়ে কবিব পায়ে কামড়ে ধরে আছে।

তেলের গন্ধে হয়তো সেগুলোর আমদানি হয়েছিল। কবি নির্বিকার চিত্তে বসে বসে পিঁপড়ের কামড় সহ্য করছিলেন। রাণী দেবী পাশে আছেন, অথচ তাঁকে একটা কথাও বললেন না। এতে রাণী দেবী যেমন দুঃখিত হ'লেন, তেমনি অপ্রস্তুতও হ'লেন।

রাণী দেবী যখন কবিকে বললেন, তিনি কেন তাঁকে কিছু বলেন নি, তখন কবি বললেন—কত বড বড কামড় সহ্য করেছি, আর এতো পিঁপড়ের কামড়। একবার ভাবলাম, বলি তোকে আমার পায়ের মাধুর্য দেখেছিস্! এত মধু পায়ে যে, পিপীলিকারও কত আমদানি হ'চ্ছে। মাধুর্য গড়িয়ে পড়ছে গো পা দিয়ে। এত মধু যার পায়ে, তার কবিতায় রস, ছন্দ বের হবেনা তো কার কবিতায় বের হবে বল দেখি!

সুগৃহিণী

শান্তিনিকেতনের একজন কর্মী সদ্য বিয়ে করে আশ্রমে আবার ফিরে এসেছেন।

কবি একথা জেনে একদিন সেই নব বিবাহিতকে ডেকে পাঠালেন।

ভদ্রলোক এসে কবিকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন।

কবির কাছে নানা রকম বই আসত। তার মধ্যে থেকে গৃহলক্ষ্মী ধরণের একখানা নতুন উপন্যাস নিয়ে কবি ভদ্রলোককে বললেন— গিন্নীকে দিও, সুগৃহিণী হবে।

বইটার ভিতরে ছবি দেওয়া ছিল। একটা ছবি ছিল—কর্তা খেতে বসেছেন। বহু রকমের ব্যঞ্জন সাজিয়ে পাশে বসে গৃহিণী ব্যজনরতা। নাকে প্রকাণ্ড নথ, কস্তাপেড়ে সাড়ি পরা। গৃহিণীটির বিরাট বপু। অর্ধাঙ্গিনী তিনি নন, কর্তাই তাঁর অর্ধাঙ্গ। ছবির তলাতে লেখা— পতিপূজা।

কবি ভদ্রলোককে ছবিটা দেখিয়ে হেসে বললেন—কি হে, এমন গৃহিণীই তো সুগৃহিণী, কি বলো ?

বলড়ুইন

কবির পার্শ্বচর সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর মাথায় টাক্‌ থাকার জন্য কবি তাঁর নাম দিয়াছিলেন বল্‌ড়ুইন। বল্‌ড অর্থাৎ টেকো। আর ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী বল্‌ড়ুইনের নামের সঙ্গে মিলিয়ে বল্‌ড থেকে করেছিলেন—বল্‌ড়ুইন।

বিশ্বভারতীর চাঁদা আদায় ব্যাপারে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী মাড়োয়ারী মহলে ঘুরতেন বলে, কবি তাঁর একটা মাড়োয়ারী ধরণের নামও দিয়েছিলন!

সুধাকান্তবাবুর সে নামটা হ'ল "সুধোড়িয়া।"

চক্ষুলজ্জা

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী একবার নতুন চশমা পরে কবিকে দেখাতে গেছেন।

চশমার কাঁচটা সাদা না হয়ে একটু নীলাভ ছিল। তাই সুধাকান্তবাবু কবিকে বললেন—সাদা কাঁচের চেয়ে একটু রঙীন কাঁচই নাকি আমার চোখের পক্ষে উপকারী, তাই ডাক্তার এই কাঁচটাই দিয়েছেন।

কবি সব শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন—যাক্, এতদিনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। স্বয়ং ভগবান তোমাকে যে জিনিষটি দিতে পারেন নি, এখন দেখছি ডাক্তাররাই তোমাকে সেটা দিলেন।

সুধাকান্তবাবু কবির রহস্য ঠিক বুঝতে না পেরে কবির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

কবি বললেন—বুঝতে পারছ না? চক্ষুলজ্জা হে! চক্ষুলজ্জা!

শ্রীচরণ কমলেষু

কবি একদিন উত্তরায়ণে তাঁর ঘরের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে পার্ষদ সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও আরও দু'একজনের সঙ্গে তাঁর স্বভাবসুলভ বহস্যালাপ করছিলেন।

কথাবার্তার মধ্যেই কবি হঠাৎ একবার থেমে গেলে, সুধাকান্তবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার শরীর ভাল আছে তো?

কবি সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন—দেখ, আমাদের মধ্যে 'শ্রীচরণ কমলেষু' লেখার যে প্রচলন আছে—তার চরণের সঙ্গে কমলের যুক্ত করবার কারণ আজ আবিষ্কার করেছি।

সকলেই বিস্মিত হযে কবির মুখের দিকে চাইলে, কবি বললেন—এখানে এত ফুল-ফল, আরও কত মধুমান পদার্থ আছে, কিন্তু তা সব ছেড়ে, দেখ মৌমাছিটা আমার পায়ে বসে "মৌ-রস" সংগ্রহ করতে এসেছে। ও নিশ্চয়ই চরণকেই কমল ভেবেছে।

সম্পত্তি দান

এক সময় এক পাগল কবিকে প্রায়ই বড় বড় চিঠি লিখত। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কত কথাই না সে লিখত। তার সংসারের কথা, তার সুখ-দুঃখের কথা, তার আত্মীয়-স্বজনের কথা—পাগলের প্রলাপে অসম্বদ্ধভাবে লিখে লিখে পাঠাত। আর তার ঐ দীর্ঘ চিঠিতে সে তার অস্তিত্বহীন বিষয়-সম্পত্তি বার বার কবিকে দানপত্র করে দিত।

ঐ পাগলের চিঠি এলে, কবি মাঝে মাঝে তাঁর পার্ষদদের ঠাট্টা করে বলতেন—এই আমার একমাত্র যথার্থ ভক্ত, যে তার সমস্ত সম্পত্তি বার বার আমায় দান করছে। তবে সম্পত্তিটা নিরাকার, তাই দানটা এত সহজ।

চীনা খাদ্য

কবি একদিন সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের কয়েকজনের সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন। শান্তিনিকেতনের চীনা ভবনের জনৈক চীনা অধ্যাপকও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

কথায় কথায় বাঙ্গালীর খাদ্যের কথা উঠল। খাদ্যের কথা উঠলে চীনা অধ্যাপক কবিকে বলিলেন—গুরুদেব, চীনা খাদ্য খাবেন? তাহলে খাবার তৈরি করে পাঠাব।

শুনে কবি খুশি হয়ে বললেন—নিশ্চয়! কি জানি কি সে খাদ্য! পাঁচ শো বছরের পুরনো ডিম, না পাখীর বাসা।

কবির কথা শুনে উপস্থিত সকলেই হেসে উঠলেন।

শুধু দোতলাটা ছেড়ে দিলেই হবে

আশ্রমে সেবার একটি নাটকের অভিনয় হবে ঠিক হয়েছে।

কবি তখন আশ্রমে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীর দোতলায় বাস করছেন। ঐ বাড়ীরই নীচের তলায় অভিনয়ের জন্য রিহারশাল চলছে।

অভিনয় আসন্ন। সেদিন ফুল রিহারশাল। সকলেই হাজির। কবি নিজে উপস্থিত থেকে রিহারশাল পরিচালনা করছেন।

রিহারশাল পুরাদমে চলেছে। ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা বেশ থমথমে ভাব। কেবল যাঁর যাঁর কথা বলার প্রয়োজন তাঁরাই কথা বলছেন। বাকি সকলে চুপচাপ শুনে যাচ্ছেন।

দিনুবাবু একটা দৃশ্যে তাঁর অংশ অভিনয় করছেন। এই অভিনয় অংশে সমস্ত বাড়ীঘর ছেড়ে দেওয়ার একটা কথা ছিল। তাই দিনুবাবু কথাগুলো বলে গেলেন।

কবি দিনুবাবুর কথা ক'টা শুনে হঠাৎ বলে উঠলেন—সব না ছেড়ে শুধু দোতলাটা ছাড়লেই চলবে!

এইরূপ একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে কবি এই কথা বলা মাত্রই সকলে হো হো করে হেসে উঠলেন।

ওতেই তা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে

শান্তিনিকেতনে একবার 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয়।

সন্তোষকুমার মজুমদার গোবিন্দমাণিক্য, প্রমথনাথ বিশি জয়সিংহ এবং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রঘুপতি সেজেছেন।

কবি সেবার অভিনয়ে কোন অংশ গ্রহণ না করে, দর্শক হিসাবেই উপস্থিত আছেন।

নাটকের একটা দৃশ্যে জয়সিংহ নিজের বুকে ছোরা মেরে পড়ে যাওয়ার ঘটনা আছে। আর জয়সিংহ পড়ে গেলে রঘুপতিরও তার উপর পড়ে যাওয়ার কথা আছে।

তাই অভিনয়ের সময় জয়সিংহ-রূপী প্রমথনাথ বিশির উপর রঘুপতি-রূপী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়ে গেলেন।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিল বিপুল দেহ। অভিনয়ান্তে প্রমথনাথ বিশি কবির সঙ্গে দেখা করতে গেলে, কবি তাঁকে বললেন—তুই যখন বুকে ছোরা মেরে পড়লি, আর তারপর দিনু যখন তোর ঘাড়ে পড়ল, আমি ভাবলাম, তোর মরতে কিছু বাকি থাকলে, ওতেই তা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

পৌত্তলিক

শ্রীনিকেতনের কোন এক বিশিষ্ট কর্মীর স্ত্রীর নাম ছিল—পুতুল।

ভদ্রলোক একটু স্ত্রৈণ ছিলেন। অফিসের সময় ছাড়া যখন যেখানে যেতেন অধিকাংশ সময়ই স্ত্রীকে তিনি সঙ্গে নিয়ে বেরুতেন।

ভদ্রলোক শ্রীনিকেতন থেকে শান্তিনিকেতনে কবির কাছে যখন আসতেন, তখনও স্ত্রীকে সঙ্গে আনতেন। আর শুধু সঙ্গেই আনতেন না, এনে অধিকাংশ সময়ই কবির কাছে স্ত্রীর গুণপনা বর্ণনা করতেন।

যেদিন হয়তো বিশেষ কোন কারণে স্ত্রীকে সঙ্গে আনা সম্ভব হোত না, সেদিনও ভদ্রলোক একাই এসে স্ত্রীর আসার বিশেষ আগ্রহ সত্ত্বেও কেন যে আসতে পারলেন না, সে সব কথাও কবিকে শোনাতেন।

স্ত্রী—পুতুলের প্রতি ভদ্রলোকের এইরূপ অনুরাগ দেখে কবি ভদ্রলোকের নাম দিয়েছিলেন, পৌত্তলিক এবং তাঁকে পৌত্তলিক বলেই তিনি সম্বোধন করতেন।

বাঁদোর

সেদিন শান্তিনিকেতনের কর্মীদের এক সভা। সভায় কবিও এসেছেন।

সভা আরম্ভ হতে তখন সামান্য দেরি।

যে ঘরটিতে সভা বসেছে, সে ঘরটি ছিল খুব প্রশস্ত ও বেশ আলো-বাতাসযুক্ত। তাই একপাশে কয়েকজন কর্মী, ঘরটি যে বেশ—সে সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

কবি চুপ করেই বসেছিলেন। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন—এই ঘরটিতে একটি বাঁদোর আছে।

কবির কথা শুনে সকলেই চম্‌কে উঠলেন এবং পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। আর যাঁরা কথা কইছিলেন, তাঁরা তো ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়লেন।

কর্মীদের এই অবস্থা দেখে কবি এবার বললেন—বাঁদর নয়, বাঁদর নয়, বাঁ-দোর। দেখ্‌ছ না ঘরটার এই দিকে যেমন একটা ডান-দোর আছে, ওদিকটায় তেমনি একটা বাঁ-দোরও রয়েছে।

কবির কথা শুনে এবারে সকলেই হেসে উঠলেন।

সৈনিক

এক সময় সৈনিক নামে একটি পত্রিকা বেরোত।

শান্তিনিকেতনের একটি ছাত্র একদিন উত্তরায়ণে কবির সঙ্গে দেখা করতে যায়। ছাত্রটির হাতে তখন একখণ্ড সৈনিক কাগজ ছিল।

ছাত্রটি কৌতূহলবশে সৈনিক-এর সঙ্গে মিলিয়ে মুখে মুখে একটি কবিতা রচনা করে দেবার জন্য কবিকে অনুরোধ করল।

কবি শুনে সঙ্গে সঙ্গেই মুখে মুখে এই কবিতাটি রচনা করে দিলেন—

যদি পার দৈনিক
চা খাইও চৈনিক।
গায়ে যদি জোর পাও
হোয়ো তবে সৈনিক।
জাপানীরা আসে যদি'
চিঁড়ে নিক্, দই নিক্
যত পারে আধুনিক কবিতার বই নিক্।

১। এই সময় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং জাপানীদের ভারত আক্রমণের কথা শোনা যায়।

এখনো দু মন

শান্তিনিকেতনে সেবার নতুন ওজনের মেসিন এসেছে। ছেলেমেয়েরা একে একে ওজন হচ্ছে।

কবি এই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং বসে ছেলেমেয়েদের এই ওজন লক্ষ্য করছিলেন।

এক এক জনের ওজন শেষ হ'লেই কবি তাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন—কিরে তুই কত হ'লি!

কবির প্রশ্নে সকলেই যে যার ওজনের মাপ বল্‌তে লাগল। এমন সময় ওজন হ'ল কবির বিশেষ পরিচিতি একটি মেয়ে। সে বেশ একটু স্থূলাঙ্গী ছিল। সে ওজনেব যন্ত্রটি থেকে নেমে দাঁডাতেই কবি তাকে বললেন—তুই কত হলি বল?

মেয়েটি হেসে কবিকে বললে—দু মণ।

এই মেয়েটির সেই সময় এক জায়গায় বিয়ের কথাবার্তা ও দেখাশুনা চলছিল। কবি একথা জানতেন। তাই তিনি তাকে পরিহাস করে বললেন—তুই এখনো দু মন, এখনো এক মন হ'লি নি?

মেয়েটি কবির কথা বুঝতে পেরে, সলজ্জভাবে হাসতে লাগল।

কুমার সম্ভব

কবির ঘনিষ্ঠ পরিচিত এক যুবক ভদ্রলোক কবিকে পিতামহ স্থানীয় ভেবে তাঁর সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করতেন।

কবিও তাঁকে নাতির ন্যায়ই দেখতেন এবং সেই সম্পর্কেই মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসাও করতেন।

একবার এই ভদ্রলোক সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবিকে প্রণাম করতে গেলেন।

কবিকে কে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর ঐ নাতি স্থানীয় যুবকটির স্ত্রী কয়েক মাসের গর্ভবতী। তাই যুবক ও তাঁর স্ত্রী কবিকে প্রণাম করলে, কবি তাঁদের আশীর্বাদ করে যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে, কুমার-সম্ভব কত দিনে হচ্ছে?

কবির কথা প্রথমে যুবকটি বুঝতে পারেন নি। তারপর বুঝতে পেরে হাসতে লাগলেন।

সুরেন মৈত্রর ঝুঁটি

কলকাতা বা অন্য কোনখান থেকে কোন সাহিত্যিক শান্তিনিকেতনে এলে, তাঁকে নিয়ে একটা করে সাহিত্য-সভা করা—এটা যেন তখনকার দিনে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

সেবার সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শান্তিনিকেতনে এসেছেন শুনে, ছাত্ররা তাঁকে নিয়ে একটা সাহিত্য-সভা করবে স্থির করল। এই স্থির করে তারা সুরেনবাবুর সন্ধানে বেরুল।

ছাত্ররা সুরেনবাবুর সন্ধানে বেরিয়ে শুনল যে, তিনি তখন কবির কাছে গেছেন।

ছাত্ররা সেখানেই গেল। গিয়ে দেখল—সুরেনবাবু কবির সঙ্গে কথা কইছেন।

ছাত্রের দল কবির সামনে গিযে দাঁড়াতেই কবি প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার?

ছাত্ররা তাদের বক্তব্য বল্‌ল।

ছাত্রদের কথা শুনে সুরেনবাবু সসঙ্কোচে বললেন—আমি কিছুই না, কিছুই না! আমি অত্যন্ত নগণ্য সাহিত্যসেবী। আমাকে নিয়ে আবার কেন!

সব শুনে কবি গম্ভীর হয়ে বললেন—দেখ, তোমরা এক কাজ করতে পারবে? তোমরা যদি সুরেনের চুলের ঝুঁটি ধরে নিয়ে যেতে পার, তবেই ও যাবে। না হলে ও কিছুতেই যাবে না।

ছাত্রদের মধ্যে একটি ছেলে খুব মুখফোঁড় ছিল, সে তো বলে বস্‌ল —তাই নিয়ে যাব।

সুরেনবাবু এই সময় মাথায় গান্ধী টুপি পরতেন।

কবি এবার সুরেনবাবুকে বললেন—সুরেন, তুমি তোমার টুপি খোল, ওরা তোমার ঝুঁটি ধরে নিয়ে যাক্।

কবির কথামত সুরেনবাবু মাথার টুপি খুললেন।

টুপি খুললে দেখা গেল—সুরেনবাবুর মাথাময় এক বিরাট টাক্। সারা মাথায় একগাছি চুলের নাম মাত্রও নেই।

টাক্ দেখে ছাত্ররা এবার হেসে উঠল।

কবি এবং সুরেনবাবু এঁরাও তখন মৃদু হাসছেন।

ঘোরবাবু

অঘোরবাবু বলে এক ভদ্রলোক এক সময় শান্তিনিকেতনে কাজ করতেন।

অঘোরবাবু কবির বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। পরে তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে অন্যত্র চলে যান।

এই অঘোরবাবুর এক যুবক পুত্র এক সময় শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এসে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। কবির কাছে গিয়ে তিনি তাঁর পিতার পরিচয় দেন।

অঘোরবাবুর এই পুত্রটি ছিলেন খুব বিলাসী এবং কাপড়ে-বাবু।

অঘোরবাবুর পুত্র কবির কাছে গিয়ে তাঁর পিতার নাম করলে, কবি তাঁর বেশভূষার পারিপাট্যের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন—অঘোরবাবুর ছেলে হয়ে, তুমি যে একেবারে ঘোরবাবু হে!

সানাই

সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) ছোট ভাই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে বিশ্বভারতীতে পড়বার জন্য শান্তিনিকেতনে আসেন। আসবার সময় বলাইবাবু ছোটভাইকে একটা পরিচয়পত্র দেন এবং সেই চিঠি নিয়ে কবির সঙ্গে দেখা করতে বলেন। বলাইবাবুর ছোট ভাই দাদার নির্দেশমত শান্তিনিকেতনে এসেই দাদার চিঠি হাতে নিয়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন।

কবি এই সময় কানে কম শুনতেন। তাই কবির সেক্রেটারী অনিল কুমার চন্দ তাঁকে বলে দিলেন—গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলবার সময় একটু জোরে কথা বোলো। উনি আজকাল কানে কম শোনেন।

সাক্ষাৎপ্রার্থীটি সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ভাই, অনিলবাবু কবিকে এই কথা বলায়, কবি শুনেই বলে উঠলেন—কি হে, তুমি কি বলাইয়ের ভাই কানাই নাকি ?

উত্তরে বলাইবাবুর ভ্রাতাটি এবার খুব জোরে চেঁচিয়ে বললেন—না, আমি অরবিন্দ।

কবি শুনে হেসে বললেন—না, কানাই নয়, এ দেখছি একেবারে সানাই।

মা ফলেষু কদাচন

সেদিন ২৫শে বৈশাখ। কবির জন্ম দিন।

কবি কলকাতায় আছেন শুনে, কবির কয়েকজন অনুরাগী ভক্ত জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে গেলেন। এঁদের মধ্যে কবি সুকুমার রায়ও ছিলেন।

কবির এই ভক্তরা চলে আসার সময় কবি তাঁদের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করলেন। জলযোগের মধ্যে মিষ্টান্ন এবং নানা ফলমূলও ছিল।

কবির এই অতিথিদের মধ্যে এক সুকুমার রায়ই ফল খেতেন না। তাই তিনি কেবল মিষ্টান্ন খেতে লাগলেন। আর সকলে মিষ্টান্ন এবং ফল দুই-ই খেলেন।

কবি সামনে বসে অতিথি সৎকার করছিলেন। সুকুমারবাবু যে ফল খেতেন না, কবি একথা জানতেন। সুকুমারবাবু ফল ছুঁলেন না দেখে, কবি তাঁকে বললেন—দেখ সুকুমার, শুনেছিলাম তুমি গীতা পাঠ করছ। তা দেখছি তোমার গীতা পাঠ সার্থক হয়েছে।

কবির কথা শুনে সুকুমারবাবু তো অবাক্। অপর সকলেও বিস্মিত হয়ে কবির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একজন কেবল বললেন—কি রকম গুরুদেব ?

উত্তরে কবি বললেন—তা না হলে এমন 'মা ফলেষু কদাচন' ও শিখ্‌ল কোথা থেকে !

কবির কথা শুনে এবার সকলেই হেসে উঠলেন।

বঙ্গবাসী

তখনকার দিনে 'বঙ্গবাসী' খুব একটা নাম করা কাগজ ছিল। যেমন তার নাম, তেমনি ছিল তার প্রচার।

এই বঙ্গবাসী শেষ দিকটায় একটু সনাতনপন্থী হয়ে উঠেছিল এবং সনাতন হিন্দুধর্মের প্রচারকে তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছিল।

সেই সময় "সঞ্জীবনী" নামে আর একটা কাগজ ছিল। এই কাগজের মালিক ও সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণকুমাব মিত্র।

কৃষ্ণকুমারবাবু সে যুগের একজন বিখ্যাত মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রগতিপন্থী ও সমাজ-সংস্কারক। তাই তাঁর কাগজ "সঞ্জীবনী"ও ছিল অনেকটা প্রগতিবাদী।

'বঙ্গবাসী' সনাতনপন্থী কাগজ বলে অনেক সময় তাতে পুরাতন কথা ছাপা হ'ত, অপর পক্ষে 'সঞ্জীবনী'তে সমাজ সংস্কারের ও প্রগতিবাদের অনেক কথা থাকত।

শরৎচন্দ্র একদিন কথাপ্রসঙ্গে কবিকে প্রশ্ন করেছিলেন—বঙ্গবাসী মাঝে মাঝে এত সব পুরাতন কথা ছাপে কেন?

উত্তরে কবি বলেছিলেন—ও যে বঙ্গ বাসী শরৎ! ওরা তো বাসী কথাই ছাপবে!

মুদ্রা

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে কবি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বেড়াতে যান। বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও কবির সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে কবি তখন বলিদ্বীপের বাহুঙ্ শহরে। সেই সময় একদিন বলিদ্বীপের এক পদণ্ড অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সঙ্গে সুনীতিবাবুর বিশেষ পরিচয় হয়। পরিচয় হ'লে পদণ্ড ভদ্রলোক, সুনীতিবাবু কি কি মুদ্রা জানেন, এ সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করেন।

উত্তরে সুনীতিবাবু বলেন—আমি সামান্য ব্রাহ্মণ মাত্র। পূজা-আচারে দক্ষ পুরোহিত বা পদণ্ড শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নই; সুতরাং মুদ্রা করতে শিখিনি।

পদণ্ড এবার বলেন—রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই পূজার অনুষ্ঠানের সব মুদ্রা করতে পারেন, আর নিশ্চয়ই তিনি এমন অনেক মুদ্রা জানেন যা বলিদ্বীপের পদণ্ডদের অজ্ঞাত।

এই বলে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে পূজার মুদ্রা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ নেবারও ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

পদণ্ডের কথা শুনে সুনীতিবাবু তাঁকে বোঝালেন—রবীন্দ্রনাথ যেভাবে পূজার্চনা করেন, তাতে তিনি মুদ্রা বা আগমোক্ত মন্ত্রের প্রয়োগ করেন না।

পদণ্ড তবুও ছাড়বেন না, একবার গিয়ে মুদ্রা সম্বন্ধে কবির সঙ্গে আলাপ করবেন-ই।

আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে—বলে সুনীতিবাবু তখন তাঁকে নিরস্ত করলেন।

সুনীতিবাবু ফিরে এসে কবিকে এই পদগুর কথা বললেন এবং তিনি যে কবির কাছে নতুন কর-মুদ্রা শিখতে আসবেন আর মুদ্রা-করণে তাঁর দক্ষতার যাচাইও যে করে যাবেন, তাও বললেন।

এই শুনে কবি হাসতে হাসতে বললেন—এই দেখ, তুমি কোথায় কার সঙ্গে আলাপ করে যত বিভ্রাট ঘটিয়ে আসবে—এখন জগতে আমার যেটুকু পসার হয়েছে এই বলিতে এসে পদগুদের দণ্ডাঘাতে সেটুকু সব বুঝি মাটি হয়ে যায়। কোনও রকমে তাকে ঠেকাও—সে যদি আমার মুদ্রার পরীক্ষা করতে আসে, তাহলে বিশ্বভারতীর জন্যে খালি ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছি, আমার আবার মুদ্রা কোথা—আমি গরীব বেচারা দাঁড়িয়ে 'ফেল' হয়ে মারা যাব।

শিশুনাগ

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডক্টর কালিদাস নাগ হলেন প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মশায়ের জামাতা।

রামানন্দবাবু ছিলেন কবির বিশিষ্ট বন্ধু। সেই হিসাবে ডক্টর নাগ কবির বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। তাছাড়া ডক্টর নাগ নিজেও ব্যক্তিগত-ভাবে কবির খুব পরিচিত ছিলেন।

ডক্টর নাগ মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে যান। একবার তিনি সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে যাবার আগে কবিকে চিঠি লিখে তাঁদের যাওয়াব কথা জানিয়ে দেন।

কবির সেক্রেটারী ডক্টর নাগের চিঠি পড়ে কবিকে জানালে, কবি শুনে বললেন—তাই তো হে, বলি নাগ-দম্পতী তো আসছেন, তা শিশুনাগ-গুলি'ক কোথায় রেখে আসছেন শুনি ?

ঠিকানা

ডক্টর কালিদাস নাগ ছাত্রজীবনেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। এম. এ. পাস করে কালিদাসবাবু একবার শান্তিনিকেতনে যান। শান্তিনিকেতনে গিয়ে সেবার তিনি কদিন থাকেন।

শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসবার সময় কালিদাসবাবু কবিকে প্রণাম করতে গেলে, কবি বললেন—তোমার ঠিকানাটা কি হে? দিয়ে যাও তো। জেনে রাখা ভালো।

কালিদাসবাবু ঐ সময় তাঁর মামার কাছে থাকতেন। তাঁর মামা বিজয়কৃষ্ণ বসু তখন কলকাতায় জু-গার্ডেনের সুপারিনটেনডেণ্ট ছিলেন। তিনি জু-গার্ডেনে কোয়ার্টার পেয়ে সেখানেই সপরিবারে বাস করতেন।

কবি কালিদাসবাবুর ঠিকানা চাইলে কালিদাসবাবু মামার ঠিকানা বোলে, প্রয়োজন হ'লে সেখানেই তাঁকে চিঠি দেবার কথা বললেন।

কয়েকদিন পরে কবির কাছ থেকে কালিদাসবাবুর নামে এক চিঠি এল। ঠিকানার ঘরে কবি লিখেছেন—

Sri Kalidas Nag

C/o Bijoykrishna Bose

Zoo-Garden

(Human Section)

……

সিনেমা দেখা হ'ল ?

১৩৪৩ সালের ৯ই, ১০ই ও ১১ই ফাল্গুন চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিংশ অধিবেশন হয়। অধিবেশনে বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার বাইরের বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক যোগ দেন।

এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ। উদ্বোধনের পর সভায় কিছুক্ষণ থেকে কবি চন্দননগরেই গঙ্গার উপরে তাঁর বোটে ফিরে যান।

সভার শেষদিকে অমল হোম, নীহাররঞ্জন রায় ও পরিমল গোস্বামী এঁরাও সভা ত্যাগ করে কবির কাছে তাঁর বোটে যান। এঁরা গিয়ে কবির সঙ্গেই আলাপ করছেন, এমন সময় কবির পার্ষদ সুধাকান্ত রায়-চৌধুরী ঘরের মধ্যে এলেন।

সুধাকান্তবাবুকে দেখেই কবি তাঁর দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—সিনেমা দেখা হ'ল ?

কবির কথা শুনে সুধাকান্তবাবু তো অবাক্। তারপর বললেন—এখন সিনেমা !

কবি বললেন—চন্দননগরে হয়তো এই সময় হয়। ঠিক জানিনে !

বৈতরণীর তীরে—আমাকে

১৩৪৩ সালে চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সময় সাহিত্যিক বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায) ভাগলপুর থেকে এসে সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন জেনে, বনফুল কবিকে উপহার দেবার জন্য তাঁর সদ্যপ্রকাশিত "বৈতরণীর তীরে" গ্রন্থেব এক কপি নিয়ে এসেছিলেন।

কবি সভার উদ্বোধন করে চন্দননগরেই গঙ্গার উপর তাঁর বোটে ফিরে গেলে, বনফুল গঙ্গায় কবির বোটে গিযে কবিব হাতে তাঁর এই সদ্য-প্রকাশিত "বৈতরণীর তীরে" গ্রন্থখানি দিলেন।

কবি বইটি হাতে নিয়ে হেসে বললেন—বৈতরণীর তীরে—আমাকে। নামটা বড ভয়ঙ্কর হে।

আহার

কবির আহারের একটা বিশেষত্ব ছিল।

আহারের সময় নানা জিনিস সাজিয়ে তাঁর টেবিলে দেওয়া হ'ত। তিনি এটা থেকে কিছু ওটা থেকে কিছু কবে চামচ দিয়ে তুলে তুলে নিতেন। কোনটাই ষোল আনা খেতেন না। আর আহার ব্যাপাবে সাধারণের ন্যায় প্রচলিত রীতিও তিনি মেনে চলতেন না। হয়তো গোড়াতেই পায়সটা খেয়ে নিলেন, তারপব খেলেন দুচারখানি আলুভাজা, নয়তো একটু মোচার ঘণ্ট, তারপর হয়তো দুটি দই-ভাত এইভাবে কোনটার পর যে কি খেতে হয়, সে সব তিনি মেনে চলতেন না।

কবির এই সাধারণের অভ্যাস-বিরোধি আহারেব কথা উত্থাপন করে বিশ্বভারতীর তৎকালীন অধ্যাপক ও গ্রন্থ-সম্পাদক শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত একবাব কবিকে বলেছিলেন—আহাব ব্যাপাবে বিদ্যাসাগর মশায়েরও এই রকম অভ্যাস-বিবোধিতা ছিল। আগে দুধমিষ্টি খেযে তারপর তিনি এক এক সময় তেতো খেতেন। বিহারীলাল সবকারেব বইয়ে এ কথা পড়েছি।

কবি একথা শুনে কৌতুক করে নন্দগোপালবাবুকে বলেছিলেন—তুমি দেখছি, প্রত্নতাত্ত্বিকদের পিশেমশাই। খুঁজে খুজে বার করেছ। এ তো জানতাম না। কোনদিন হয়তো আমার কথাও তুমি আবার লিখে বসবে। তবে তাতে সুবিধে হবে একটা এই যে, লোকে বলবে—বিদ্যাসাগর আব রবি ঠাকুবের অন্ততঃ একটা বিষযে মিল ছিল, খেতে বসলে দুজনেরই বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেত।

চা-পান

প্রাতরাশের সময় কবি প্রায়ই এঁকে-তাঁকে টেবিলে ডেকে নিতেন। এইভাবে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও গ্রন্থ-সম্পাদক নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে একদিন ডেকে আনলেন।

চা বণ্টনের সময় কবি নন্দগোপালবাবুকে লক্ষ্য করে বললেন—ওরে, ওকে দাক্ষিণ্য সহকারে চা দে, ওরা হ'ল শরতের দল, পেয়ালার বদলে ঘটির মাপে চা খায়।

শরৎ হলেন শরৎচন্দ্র। একদিন শরৎচন্দ্র কলাইয়ের মগ ভর্তি করে কবির সামনে চা খেয়েছিলেন।

কবি মাঝে মাঝে সেই গল্প বলতেন, আর হাসতেন।

পানমার্গে অগ্রগতি

প্রাতরাশের একটু পরেই কবি এক গ্লাস সরবৎ খেতেন।

আম, কলা, কমলালেবু প্রভৃতি কোন না কোন ফলের নির্যাস থেকেই সাধারণতঃ এই সরবৎ বানানো হ'ত।

একদিন সরবৎ খাবার সময় নন্দগোপাল সেনগুপ্ত কবির কাছে গেলে, কবি তাঁকেও সরবতের বখরা দিলেন।

সেদিন টম্যাটো থেকে সরবৎ তৈরি হয়েছিল।

টম্যাটোর সরবৎ নন্দগোপালবাবুর ভাল লাগছিল না, অথচ তিনি সরবতের বিরুদ্ধেও কিছু বলতে সাহস করছিলেন না।

কবি নন্দগোপালবাবুর মুখ দেখেই তা বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন— কি হে, ভাল লাগছে না তোমার? এ যে অতি উৎকৃষ্ট পানীয়! তা হ'লে তো দেখছি পানমার্গে তোমার বেশি অগ্রগতির আশা নেই!

নোঙর করাই রইলেন

শেষ জীবনে কবির বিজ্ঞান পড়ার দিকে একটা প্রবল ঝোঁক আসে। এই সময় তিনি বহু বিজ্ঞানের বই পড়েন। আর শুধু পড়াই নয়—আপেক্ষিকতাবাদ পরমানুবাদ ইত্যাদির আশ্রয়ে নব্য পদার্থ বিজ্ঞান যে একটি নতুন পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তা সহজ করে দেশবাসীকে বোঝানোর জন্য তিনি "বিশ্ব-পরিচয়" নামে একটি বইও লেখেন।

এই "বিশ্ব-পরিচয়" গ্রন্থের কথা উল্লেখ করে কবি একদিন নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে বলেন—এটা আমার অব্যবসায়ীর উদ্যোগ হ'ল হে! হয়তো অনেক ত্রুটি রয়ে গেল। তবু পথটা তো খুলে দিলাম। এবার অন্যরা লিখুন।

শুনে নন্দগোপালবাবু বললেন—এর ব্যবসায়ীরা তো কেউ জন-সাধারণ সম্বন্ধে মনে মনে দয়া পোষণ করেন না। নইলে অমুক অমুক লিখতে পারেন।

কবি হেসে বললেন—ওঁরা বিদ্যের জাহাজ। কিন্তু নোঙর করাই রইলেন।

সজীব

কবি একবার তাঁর এক ভক্তের অনুরোধে তাঁর বাড়ীতে বেড়াতে যান।

একটি সুন্দর কাঠের চেয়ারে কবিকে বসতে দেওয়া হ'লে কবি তাঁর ভক্তটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে, তোমার এ চেয়ার সজীব নাকি?

ভক্তটি তো কবির কথার অর্থ কিছুই বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

কবি তখন বললেন—বুঝতে পারছ না? আমি বলছি, সজীব কি না? জীবের সহিত বর্তমান, অর্থাৎ ছারপোকা আছে কি না?

কবির কথা শুনে ভক্তটি এবার হেসে উঠলেন।

নেপোলিয়নের কথা মনে হয়েছিল

কবি তখন ইউরোপে।

একদিন তিনি সেখানে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডের কোন এক পর্বত শিখরে কিছু দেখতে যান।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তায় সকলেই পর্বত-শিখরে গিয়ে উঠলেন। তারপর দ্রষ্টব্য সন্দর্শনের পর ফিরলেন।

ফেরার পথে সকলেই কবির মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করে তাঁরা জানলেন—কবির জুতোয় একটা কাঁটা উঠেছে, ফলে হাঁটা কষ্টকর হচ্ছে।

কবি জুতো খুললে, বন্ধুরা দেখলেন—কাঁটা ওঠাটা সাম্প্রতিক নয়। আরোহণ কালেই কিভাবে কাঁটা ওঠায় পা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। রক্তে মোজা ভিজে গেছে। জুতোতেও রক্তের ছোপ পড়েছে।

আরোহণকালে কবি বন্ধুদের কিছুই জানতে দেন নি। এত কষ্ট হ'লেও গতি ঠিক রেখেছিলেন। কিন্তু ফিরবাব পথে এমন হয় যে, ঐ অবস্থায় হাঁটা একেবারে কষ্টকর হয়ে পড়ে।

বন্ধুরা কবিকে এমন নীরবে কষ্ট সহ্য করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, কবি বললেন—তখন নেপোলিয়নের কথা মনে হয়েছিল। তিনি পাহাড়ে-পর্বতে কত কষ্ট ভোগ করেছেন। অথচ কোন দিনই কোথাও তাঁর কোনরকম ধৈর্যচ্যুতি হয় নি। এই নেপোলিয়নের কথা মনে হওয়াতেই পাহাড়ে উঠবার সময় অত কষ্ট সহ্য করেছিলাম।

ভূত

একবার এক ভদ্রলোক কবিকে লেখেন—আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন ?

ভদ্রলোক ঐ সঙ্গে কবিকে একথাও জানিয়াছিলেন যে, তিনি কিন্তু ভূতে বিশ্বাস করেন, এমন কি তিনি ভূত দেখেছেনও।

কবি তাঁকে উত্তরে লেখেন—বিশ্বাস করি বা না করি—তবে তাদের দৌরাত্ম্য মাঝে মাঝে টের পাই। সাহিত্যে, পলিটিক্সে সর্বত্রই এক এক সময় তুমুল দাপাদাপি জুড়ে দেয় ওরা। দেখেছিও অবশ্য—দেখতে ঠিক মানুষেরই মত।

বাঘেরা যখন পান খেতো

কবি অনেক সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাদের গল্প শোনাতেন।

একবার একটি বাচ্ছা মেয়েকে এক গল্প বলেছিলেন। গল্পটির বিষয় বস্তু ছিল—বাঘেরা যখন পান খেতো, তখন লোকে কি শান্তিতেই না বাস করত।

গল্প শুনতে শুনতে শ্রোতার পক্ষে যা স্বাভাবিক, সে জিজ্ঞাসা করলে—পান খেতো? সেজে দিত কে?

—সেজে দেবার ভাবনা কি? মণিকা, ঝর্ণা, শান্তা, কত মেয়েই যে ছিল বাঘের গুহায়!

—কি সর্বনাশ! খেয়ে ফেলতো না বাঘে?

—খাবে কেন? একে মহানুভব বাঘ, তার উপর পান সেজে দিত যে!

বিবাদ

কবির চিঠিপত্রের একটি সংকলন ছাপানোর তখন আয়োজন চলছিল।

একটি চিঠিতে সেই সময়কার কোন এক জীবিত ব্যক্তির সম্বন্ধে কবির কিছু মন্তব্য ছিল।

তাই যাঁর উপর এই চিঠিপত্র সম্পাদনার ভার ছিল, তিনি ঐ চিঠিটি হাতে নিয়ে কবির কাছে গিয়ে বললেন—চিঠির মধ্যের এই অংশটা কি বাদ দেব ?

কবি শুনে বললেন—নিশ্চয় নিশ্চয়, বাদ দাও, নইলেই বিবাদ হবে।

মেসিন গান

কবির সহনশীলতা ছিল আশ্চর্য রকম। কত লোক কত ভাবে যে এসে তাঁর সময় নষ্ট করতো তার ইয়ত্তা নেই।

লোকে এইভাবে তাঁর সময় নষ্ট করলেও, পাছে আঘাত পায়, এই ভেবেই কাকেও তিনি আভাসে ইঙ্গিতেও চলে যেতে বলতেন না।

একবার কোন এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর পুত্র কবির কাছে যান। এই বিজ্ঞানীর পুত্রটি তখন মস্তিষ্ক বিকারে আক্রান্ত। তিনি কবির কাছে গিয়ে কবিকে দেশী হাপু গান শোনাতে থাকেন।

ভদ্রলোকে আভাস-ইঙ্গিতেও চলে যাবার কথা জানালে, পাছে আঘাত পান এই ভয়েই কবি কিছু বলতে না পেরে চুপ করে বসে রইলেন।

পরে বিজ্ঞানীর পুত্রটি চলে গেলে, কবি তাঁর পার্ষদদের বললেন—বাবা! গান বটে, একেবারে মেসিন গান!

সহঃ সম্পাদক

কবি একদিন কয়েকজনের সঙ্গে একটি পত্রিকার কথা আলোচনা করছিলেন।

কথায় কথায় কবি বললেন—এক সময় আমি ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম।

কবির কথা শুনে একজন কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, অমুক কি ঐ পত্রিকার তখন সহঃ সম্পাদক ছিলেন?

কবি কৌতুক করে বললেন—সহ কি দুঃসহ বলতে পারি না, তবে ছিলেন বলে মনে হচ্ছে।

বিনাযন্ত্রে গান

কবি তখন বেলঘরিয়ায় তাঁর এক ভক্তের বাড়ীতে অতিথি।

এখানে এসেও কবির দর্শনার্থীর সংখ্যা আদৌ কমে নি। প্রতিদিনই কত রকমের লোকই না দেখা করতে আসে।

এক ভদ্রলোকের ভাগনী রবীন্দ্র-সংগীত শিখছিল। তাই তিনি তো ভাগনীকে সঙ্গে নিয়ে একদিন কবির কাছে গেলেন।

কবি মেয়েটির সঙ্গে গান নিয়ে কথা সুরু করলেন। তারপর মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি বিনাযন্ত্রে গান গাইতে পার?

মেয়েটি কলেজের ছাত্রী। খুব চালাকও ছিল। সে তো কবির কথা শুনে ভাবতে লাগল—বিনা না বীণা? কবি এর কোন্‌টা বলতে চান?

এই ভেবে মেয়েটি মৃদু হেসে সলজ্জভাবে কবিকে বললে—বিনা না বীণা?

কবি হেসে বললেন—তুমি যেটায় জান, তাই বল।

সু-কর

কবির কাছে একদিন তাঁর এক অতিথি এলে, তিনি ভৃত্য বনমালীকে ফরমাস করলেন—চট্ করে চা করে নিয়ে আয়।

বনমালীর চা আনতে দেরি হচ্ছে দেখে, কবি তাঁর অতিথিকে বললেন—বনমালী আমার চা-কর বটে, কিন্তু সু-কর নয়।

অতিথি চা-করকে 'চাকর' এবং সু-করকে 'শূকর' শুনলেন। তাই তিনি কবির পরিহাসের অর্থ বুঝতে না পেরে কবির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

কবি বুঝিয়ে দিলে অতিথিটি এবার হেসে উঠলেন

ধাঁধা

কবি তাঁর পার্শ্বচর, অন্তরঙ্গ ও ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্তায় যেমন হাস্য-পরিহাস করতেন, তেমনি মজা করবার জন্য মাঝে মাঝে তাঁদের ধাঁধাঁরও প্রশ্ন করতেন।

একবার তিনি তাঁর এক ভক্তকে বলেন—আচ্ছা, তিন অক্ষরে এমন একটা শব্দের নাম কর, যার আদ্যক্ষরটা ছেড়ে দিলে 'কান' থাকে না; দ্বিতীয় অক্ষরটা ছেড়ে দিলে 'মান' থাকে না। আর সব ছেড়ে দিলে প্রাণ থাকে না।

ভক্তটি তো আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। কিছুতেই আর শব্দটি বার করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি কবিকে বললেন—আপনিই বলে দিন।

কবি তখন বললেন—সে শব্দটা কি জানো, শব্দটা হচ্ছে 'কামান'। এবার আমার প্রশ্নের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ। প্রথম অক্ষর 'কা' ছেড়ে দিলে কান থাকে না, থাকে মান। দ্বিতীয় অক্ষর 'মা' ছেড়ে দিলে মান থাকে না, থাকে কান। আর তিনটি অক্ষর অর্থাৎ কামান ছাড়লে কি কারও প্রাণ থাকে? বলো?

কবির কথা শুনে ভক্তটি বিস্মিত হয়ে গেলেন।

অচল ও সচল

মহাত্মা গান্ধী একবার শান্তিনিকেতনে এসেছেন।

মহাত্মাজী কবির অতিথি।

কবির ঘরে মহাত্মাজীর সঙ্গে কবির তখন কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় কবি বললেন—আমি অচল, আপনি সচল।

মহাত্মাজী বললেন—আপনি কবিগুরু যে।

কবি বললেন—আর আপনি যে বিশ্বগুরু।

মহাত্মাজী আবার বললেন—তবুও আপনি বড়। আপনি যে বিশ্বগুরুর গুরু। আমার প্রণম্য।

উভয়েই এবার হাসতে লাগলেন।

পাশে পাশে

কবি সেবার ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছেন।

ইউরোপে গিয়ে সেবার আইনস্টাইনের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়। পরিচয় হ'লে আইনস্টাইন কবিকে বললেন—আপনাকে চিনেই ভারতবর্ষকে চিনলাম।

কবি বললেন—ভুল হ'ল। ভারতবর্ষকে চিনতে পেরেছেন বলেই আমাকে চিনতে পারলেন।

আইনস্টাইন এবার বললেন—ঠিকই বলেছেন। ভারতবর্ষের আপনি হলেন মধ্যমণি। ভারতবর্ষের রবি যে!

কবি হেসে বললেন—আপনাদের দেশে কি রবির উদয় হয়নি!

আইনস্টাইনও হেসে বললেন—আমাদের দেশে রবির প্রভাব সব সময়ই কম। দূরে এবং পাশে হেলে থাকেন কিনা!

এবার থেকে দূরে নয়, পাশে পাশেই থাকব—বলে কবি মৃদু হাসতে লাগলেন।

চাষা

কবির জন্মতিথি উপলক্ষে প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সেবার শান্তিনিকেতনে গেছেন।

রামানন্দবাবু গিয়ে আশ্রমের একটি বাড়ীতে উঠেছেন।

রামানন্দবাবু যে বাড়ীতে উঠেছেন কবি এক সময় সেখানে একটি যুবককে সঙ্গে নিয়ে রামানন্দবাবুর সহিত দেখা করতে গেলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর কবি যুবকটিকে দেখিয়ে রামানন্দবাবুকে বললেন—আপনি এই চাষাটির সঙ্গে আলাপ করুন।

যুবকটি ছিলেন কবির আত্মীয়। তিনি অল্পদিন আগেই আমেরিকা থেকে কৃষিবিদ্যা শিখে আসেন।

শূন্য

কবির বিশেষ পরিচিত কোন এক ভদ্রমহিলা 'শূন্য' বানান লিখতে কেবলই ভুল করতেন। তিনি 'শূন্য' বানানে ন-এ য-ফলা না লিখে ণ-এ য-ফলা লিখতেন।

এই দেখে কবি একদিন সেই ভদ্রমহিলাকে ডেকে বললেন—দেখ তুমি শূন্য লিখতে ন-এর জায়গায় ণ লেখ কেন? দেখছ, যে শূন্য যার কিছুই নাই, সে মাথা উঁচু করবে কি করে শুনি?

কবির এই কথার পর থেকে ভদ্রমহিলা জীবনে আর কোনদিনই শূন্য বানান লিখতে ভুল করেন নি। কখনো কোন প্রসঙ্গে শূন্য শব্দ লিখতে গেলেই, অমনি কবির ঐ কথাটা তাঁর মনে পড়ে যেত—যে শূন্য, যার কিছু নেই, সে মাথা উঁচু করবে কেমন করে?

চিনির গান

এইচ, পি, মরিস নামে একজন অধ্যাপক এক সময় শান্তিনিকেতনে কিছুদিন ছিলেন। তিনি এখানে ইংরাজী ও ফরাসী পড়াতেন। মরিস সাহেব ছিলেন বোম্বাইয়ের অধিবাসী, জাতিতে পার্শী।

মরিস সাহেবের বাঙ্গলা শিখবার খুব আগ্রহ ছিল। বাঙ্গলা নতুন কোন ব্যবহার শুনলেই তিনি টুকে রাখতেন এবং সুযোগ পেলেই তা ব্যবহার করতেন। বলা বাহুল্য অনেক সময়েই সে ব্যবহার অপব্যবহার হ'ত। কিন্তু তাতেও তাঁর উৎসাহ বাধা পেত না। ভদ্রলোকের মাথায় বোধ হয় একটু ছিট্ ছিল। তবে কিন্তু তিনি বড় সরল মানুষ ছিলেন।

একা থাকলে মরিস সাহেব সর্বদাই গুন গুন করে গান করতেন। একদিন তিনি শান্তিনিকেতনের তৎকালীন ছাত্র প্রমথনাথ বিশিকে বলেন—গুরুদেব 'চিনি'র উপর একটি গান লিখেছেন। গানটা শুনবে? শোন।—এই বলে গুন গুন করে বললেন—চিনি গো চিনি, তুমি বিদেশিনী, তুমি থাকো সিন্ধুপারে।

এরপর মরিস সাহেব গানটির ব্যাখ্যা করে বললেন—যখন বিলাতি চিনি সমুদ্রপার থেকে আসত, এ গান তখন লেখা। গানটি বড় মিষ্টি।

শুনে প্রমথবাবু বললেন—চিনির গান মিষ্টি তো হবেই; কিন্তু এ ব্যাখ্যা আপনি কোথায় পেলেন?

উত্তরে মরিস্ সাহেব বললেন—কেন, গুরুদেব আমাকে বলে দিয়েছেন।

লাস দেখতে চাই

কলকাতার জনৈক বিশিষ্ট সাহিত্যিক একবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে কয়েক দিন ছিলেন। তিনি গিয়ে "গেষ্ট হাউসে" উঠেছিলেন।

একদিন কবি তাঁকে বললেন—আজ রাত্রে তুমি আমার অতিথি। আমার এখানে যাবে।

ঐদিন সন্ধ্যার পর ঐ সাহিত্যিক ভদ্রলোক কিন্তু আশ্রমের এক অধ্যাপকের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে সেখানে তো বেশ জমে গেলেন। গল্পে গল্পে অনেক রাত হয়ে গেল। কবি যে রাত্রে তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছেন, একথা তিনি একবারেই ভুলে গেলেন।

এদিকে ঐ সাহিত্যিক ভদ্রলোক আসছেন না দেখে, কবি তো অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁকে ডাকবার জন্য কবি নিজের সেক্রেটারীকে গেষ্ট হাউসে পাঠালেন। কিন্তু গেষ্ট হাউসে তাঁকে পাওয়া গেল না। কবির সেক্রেটারী ফিরে এলেন।

কবি বললেন—কোথায় গেল খুঁজে দেখ।

শুধু কবির সেক্রেটারীই নয়, আরও দুএকজন তাঁকে খুঁজতে বেরুলেন। তাঁরা অনেক জায়গাই খুঁজলেন, কিন্তু ঐ সাহিত্যিক ভদ্রলোক কোথায় কার ঘরে বসে যে গল্প করছেন, তা আর তাঁরা টের পেলেন না।

সকলেই কবির কাছে ফিরে এসে বললেন—না, কোথাও পাওয়া গেল না।

এই সময় কবির মাটির বাড়ী তৈরী হওয়ায় উত্তরায়ণের সামনেই একটা খাত ছিল। কবি এই খাতটার কথা উল্লেখ করে বললেন—দেখ, তোমাদেব আমি কতদিন থেকে বলছি, খাতটা ভরাও, ভরাও। তা তোমরা কিছুতেই আমার কথা শুনবে না। আমার যতদূর মনে হচ্ছে, সে নিমন্ত্রণ খেতে আসবাব সময় অন্ধকারে ঐ খাতে পড়ে নিশ্চয়ই মাবা গেছে। আর তোমরা আমার ভয়ে লাসটা সরিয়েছ। আমি কিছু শুনতে চাইনে, তার লাসটাও অন্ততঃ আমি দেখতে চাই। তার লাশ এনে আমাকে দেখাও।

কবি এমন গম্ভীবভাবে কথাগুলো বললেন যে, উপস্থিত সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

সভাপতি

কবি সেবার মাত্র দু'চার দিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন। তাই প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর নানা কাজে ব্যাপৃত। এক একদিনে দু'তিনটে করে মিটিং চলছে। আর বাড়ীতে সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের ভীড়ও অহোরাত্র।

এরই মধ্যে একদিন রবীন্দ্র-পরিষদের মিটিংএ প্রেসিডেন্সী কলেজে আসবেন বলে কবি সভার উদ্যোক্তাদের কথা দিলেন।

সভার দিন কবিকে সভায় আনবার জন্য উদ্যোক্তাদের নির্দেশমত মৈত্রেয়ী দেবী গাড়ী নিয়ে গেলেন।

মৈত্রেয়ী দেবী জোড়াসাঁকোয় কবির বাড়ীতে গিয়ে দেখেন—কবি তখন তিনতলার ঘরে কয়েকজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক পরিবৃত হয়ে একটা বড় টেবিলের সামনে বসে আছেন।

মৈত্রেয়ী দেবী একপাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

মৈত্রেয়ী দেবীকে দেখে কবি বলে উঠলেন—কিগো এই অসময় ? আমি যে এই এখনই এঁদের সঙ্গে বেরুচ্ছি, একটা জরুরী মিটিং আছে। ওঃ হোঃ আজ বুঝি রবীন্দ্র-পরিষদে যাব বলেছিলুম। কিন্তু সে তো হ'ল না। কি করি বলো। এঁদের এখানে তো যেতেই হয়। এঁরা কত আগে থেকে এসে বসে আছেন।

উপস্থিত ব্যক্তিরা কোন কথা বললেন না। তাঁরা অবশ্য চুপ করেই রইলেন।

কবির কথা শুনে মৈত্রেয়ী দেবী তো মহা-মুস্কিলে পড়ে গেলেন। তিনি যে-সভাস্থল থেকে এসেছেন, সেখানে বিরাট জনতা কবির জন্য কিভাবে অপেক্ষা করে আছে, তার চেহারা তাঁর মনে পড়ল। আর কবির এই মত পরিবর্তনের ফলে সভার উদ্যোক্তারা ও অপেক্ষমান জনতা কবিকে যে কিরূপ ভ্রূকুটি কটূক্তি করবে, তা ভেবেও মৈত্রেয়ী দেবীর যেন হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হ'ল।

মৈত্রেয়ী দেবী কবিকে কোন কথা বলতে না পেরে বিমর্ষ হয়ে শুধু ভাবতে লাগলেন।

এমন সময় কবি হেসে উঠে বললেন—আরে না, না, দেখছ না, কি রকম সেজেগুজে বসে আছি, তোমরা নিতে আসবে বলেই তো—খালি মালা চন্দনটা বাকি।

কবির এই কথা শুনে মৈত্রেয়ী দেবী যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠলেন।

কাকে ?

কবির নাতনী নন্দিতা দেবীর বিয়ের কথাবার্তা যেদিন পাকা হয়, মৈত্রেয়ী দেবী সেদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন।

বিয়ে ঠিক হয়েছে, এই খবর শুনে মৈত্রেয়ী দেবী এবং আরও কয়েকজন কবির কাছে গেলেন।

কবি তখন তাঁর লিখবার ঘরে টেবিলের উপর ঝুঁকে নিবিষ্ট মনে "শেষ কথা" গল্পটি লিখছিলেন।

মৈত্রেয়ী দেবীরা দল বেঁধে কবির পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁদের মধ্যে থেকে একজন বললেন—গুরুদেব, নাতনীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, আমরা খাব।

কবি শুনেই তৎক্ষণাৎ লেখা বন্ধ করে চেয়ারে ঘবে যেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন, এমনি মুখের ভাব করে জিজ্ঞাসা করলেন—কাকে ?

কবির মুখের ভাব দেখে মৈত্রেয়ী দেবীরা তো থতমত খেয়ে গেলেন।

তারপর কবি হেসে উঠলে, সকলেই হাসতে লাগলেন।

চালকুমড়ার রস

কবি তখন মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর অতিথি। একদিন তিনি মৈত্রেয়ী দেবীকে বল্লেন—দেখ, কে একজন বলছিল, সে কোথায় শুনেছে, সুন্দরী মেয়ে ছাড়া আর কাউকে নাকি আমি কাছে আসতে দিই নে। আহাঃ শুনে রোমাঞ্চ হয়। এ ব্যবস্থা করতে পারলে মন্দ হ'ত না! আর যারা এ কথা বলে তারা তোমায় নিশ্চয় দেখেনি। তোমার কি গতি হ'ত তাহলে?

কবির কথা শুনেই মৈত্রেয়ী দেবী বললেন—কী অপমান! কেবল বয়স আর চেহারা নিয়ে এ অপমান সহ্য হয় না।

—না, না, বয়স নিয়ে তো আমি কিছু বলিনি। আমি তো স্পষ্টই জানি তোমার বয়স পঁয়তাল্লিশের একটুও বেশি নয়।' হ্যাঁ, আমার সম্বন্ধে আরো কী কী শুনেছি শোন—আমার নাকি একটা কাচের ঘর আছে, তার সমস্ত ছাদটা কাঁচের ডোম। রাত্রিবেলা তার ভিতর দিয়ে আকাশের তারা দেখি। ভোরবেলা সুন্দরী মেয়েদের গান শুনে তবে আমার ঘুম ভাঙে। আর স্নানের যে আয়োজন! সোনার গামলায় জল, তাতে যে আতর ব্যবহার হয়, তার এক তোলার দাম ১০০৲ এবং ঐ দামী আতরটা আমার চাই-ই।

—আমি আরো গল্প জানি। ডালিমের রস খেয়েই তো আপনার রং অত ফরসা, রোজ খাবার পর একটু স্প্যানিশ ওয়াইন আপনার চাই-ই!

—সত্যি নাকি একেবারে স্প্যানিশ? অন্য কিছু হবে না? তা এত সব শুনেও তো তোমার আতিথ্যের কিছু উন্নতি দেখছি নে। চারদিকে একেবারে শুকনো খট্‌খটে। কোথায় বা স্প্যানিশ ওয়াইন আর কোথায় বা স্পার্কলিং বার্গাণ্ডি? আছে খালি চালকুমড়ার রস।

১। এই সময় মৈত্রেয়ী দেবীর বয়স মাত্র ২৩।২৪ ছিল।

টাকার থলি

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মটা পাহাড় অঞ্চলে কাটাবার জন্য ১৪ই মে তারিখে কবি পুরী থেকে মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়ীতে বেড়াতে যান

আগে থেকে টেলিগ্রাম করে দেওয়ায় মৈত্রেয়ী দেবী নিজে স্টেশনে এসে কবিকে ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়ীতে পৌঁছেই কবি গম্ভীর হয়ে তাঁর পার্ষদ সচ্চিদানন্দ রায়কে বললেন—ওরে আলু, আমার সেই টাকার থলিটা সাবধানে রাখিস্, এখানে আবার বলতে নেই, সকলের স্বভাব তেমন সুবিধের নয়।

তারপর কবি মৈত্রেয়ী দেবীকে বললেন—আলু নামের উৎপত্তিটা জানো তো? ওর একটা মজবুত রকম সংস্কৃত নাম ছিল, কিন্তু সে এখন আর কেউ জানে না। যেদিন শুনলুম ও পটোলের ভাই, সেইদিন থেকে ও আলু। আজকাল আবার দিশী আলুতে কুলোচ্ছে না, তাই বলি Potato। আমার একদিকে বলড্বুইন, একদিকে পটেটো—জোরালো সব নাম।

পূর্বের টাকার থলির প্রসঙ্গ তুলে মৈত্রেয়ী দেবী কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন—টাকার থলিটা কি?

শুনেই কবি বলে উঠলেন—ওই দেখ, ঠিক দৃষ্টি পড়েছে। যার যা স্বভাব। পুরীতে আমায় পার্স উপহার দিয়ে ছিল। জানো, ওর মধ্যে আছে উনিশ টাকা আট আনা। আজকাল আর সেদিন নেই—তাতে আছে তাজা উনিশ টাকা আট আনা, তা যে জায়গায় এসেছি এখন সামলে রাখতে পারলে হয়!

ছবি

মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়ীতে থাকার সময় কবি একদিন মৈত্রেয়ী দেবীকে বললেন—চল এইবার স্থির হয়ে বসবে, তোমার ছবি আঁকব। অবশ্য আশাও কোরো না যে সে ছবি তোমার মত হবে, কিংবা আশঙ্কা।

একটা গল্প শুনেছিলুম, একজন খুব বিশ্রী দেখতে লোক এক বড় আর্টিষ্টকে দিয়ে অনেক খরচ ক'রে ছবি আঁকান। পরে ছবি আনতে গিয়ে সে চেহারা দেখে চটে অস্থির, বলে, এও কি একটা ছবি? তুমি যত বড় আর্টিষ্টই হও I must say it is a very bad work of art. আর্টিষ্ট বললে, তা কি করব You must admit that you are a bad work of nature.

দেখ আমি কখনই তোমাকে একথা বলব না, কিছুতেই না, সত্য হ'লেও না, মনে হ'লেও চেপে যাব।

কল্পনা

অটোগ্রাফ লেখার কথা উত্থাপন করে কবি মংপুতে একদিন মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন—কত অটোগ্রাফই লিখেছি জীবনে, অটোগ্রাফের হরির-লুট।

শুনে মৈত্রেয়ী দেবী বললেন—আমায় কিন্তু কখনো দেন নি।

—বটে, আর যে তিনশো চিঠি লিখলুম সেগুলো কি ?

—চিঠি, কোথায় চিঠি ? খান তিনেক বড় জোর।

—অয়ি অনৃতবাদিনি, আমি চিঠি লিখতে পারিনে, বলতে চাও !

এমন সময় মৈত্রেয়ী দেবীর মাসীমা সেখানে এলে কবি তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন—এই যে মাসী, তোমার ভাগনীর সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছে, উনি বলতে চান, উনি আমার চেয়ে অনেক ভাল চিঠি লিখতে পারেন। এ সম্বন্ধে তোমার বিচার কি বল।

মৈত্রেয়ী দেবী কবির কথা শুনে বললেন—বাঃ, কখন বল্লুম এ কথা !

—হয়তো বল নি, কিন্তু বলতে তো পারতে। সর্বদা একেবারে খাঁটি সত্য বলবো যদি, কবি বলে মানবে কেন লোকে ? কল্পনা শক্তি নেই আমার ? কবি-খ্যাতি বজায় রাখতে হ'লে কত হিসেব করে চলতে হয় !

ত্রিশ দিনের হিসাব

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে কলকাতায় ছায়া সিনেমায় বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে "বর্ষামঙ্গল" অভিনয় করার পর কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন। 'গয়েই হঠাৎ তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হলেন।

কবির এই অসুখের সময় দেশবাসী অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়েছিল। ভগবদ্ কৃপায় কিছুদিন পরেই কবি নিরাময় হয়ে ওঠেন।

মাস ছয়েক পবে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে কবি আবার বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ঐ ছায়া সিনেমাতেই 'চণ্ডালিকা' অভিনয়ের আয়োজন করেন। এই সংবাদ শুনে কবির জনৈক ভক্ত আবাব যদি কিছু হয়, এই ভয় করে অনুযোগের সহিত কবির কাছে এক চিঠি দেন।

কয়েকদিন পরেই কবি দলবল নিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে জোড়া-সাঁকোয় এলে, কবির ঐ ভক্তটি কবির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

কবি তাঁকে দেখে বললেন—আবার অভিনয় কবব শুনে, তুমি তে খুব উদ্বিগ্ন হয়েই চিঠি দিয়েছিলে!

—তা কি করব! গেল বারে যা ব্যাপার দাঁড়িয়েছিল! তখন তে দুর্ভাবনায় আমরা অস্থির হযে পড়েছিলাম।

কবি হেসে প্রশ্ন করলেন—আমার সেই অসুখের সময় তুমি কিভাবে কাটিয়ে ছিলে?

—পনের দিন ভাবনায় না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি।

কবি এবার হাসতে হাসতে বললেন—তা হ'লে তো ঠিক হয়েছে। সেবার পনের দিন নিদ্রা ত্যাগ করেছ, আর এবার যদি কিছু হয়, পনের দিন আহার ত্যাগ করবে। তাহলেই ত্রিশ দিনের হিসাবটা ঠিক থাকবে।

কবি-সম্রাট

সেবার কবির অসুখ।

এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা না হয়ে কবিরাজী চিকিৎসা হচ্ছে।

কবিরাজ এসেছেন।

কবি বিছানায় শুয়ে শুযে কবিবাজকে পবিহাস করে বললেন—দেখ, কবিরাজ, আমি কিন্তু তোমার চেযেও বড। তুমি কবিরাজ আর আমি কবিসম্রাট—অবশ্য লোকে বলে।

কবির কথা শুনে কবিবাজ বিস্মিত হলেন

মরণ শরণ নিয়েছে

কবির আশী বৎসরের জন্ম-তিথির কয়েকদিন আগেকার কথা। কবি তখন খুবই অসুস্থ। শয্যাশায়ী।

যুগান্তর পত্রিকায় কবির এই জন্ম-তিথিতে কবির ঐ সময়কার একটা ফটো ছাপা হবে ঠিক হলে, ফটো আনবার জন্য নন্দগোপাল সেনগুপ্ত একদিন শান্তিনিকেতনে যান।

নন্দগোপালবাবু ইতিপূর্বে বিশ্বভারতী ছেড়ে যুগান্তর পত্রিকায় এসে যোগ দেন।

নন্দগোপালবাবু শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখেন—কবি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। তাই তিনি একটা মোড়া নিয়ে কবির পায়ের কাছটায় গিয়ে বসলেন। বসে আস্তে আস্তে কবির পায়ে হাত বোলাতে লাগলেন। দেখলেন—কবির পা দুটো বেশ ফুলেছে।

কবির পায়ের ফোলা যে নন্দগোপালবাবু টের পেয়েছেন, কবি তা বুঝলেন। তাই তিনি হেসে বললেন—মরণ চরণে শরণ নিয়েছে। আর ওকে বিমুখ করব না হে।

গ্ল্যাক্সো খোকা

কবি যখন শেষবার শান্তিনিকেতনে পীড়িত হয়ে পড়লেন, তখন ডাক্তাররা তাঁকে গ্ল্যাক্সো সেবন করবার জন্য পরামর্শ দেন।

কবি এতে অত্যন্ত কৌতুক বোধ করে রোগ শয্যায় শুয়েই পরিহাস করে বলতেন—আজ থেকে আমি গ্ল্যাক্সো খোকা (Glaxo baby)।

অসুস্থ অবস্থায় বেশি ঘন দুধ (গ্ল্যাক্সো) কবির হয়তো সহ্য হবেনা, এই আশঙ্কায় ডাক্তাররা কবির শুশ্রূষাকারিণীদের প্রথমে কবিকে দু'মাসের শিশুর উপযোগী করে দুধ (গ্ল্যাক্সো) তৈরী করে দিতে বলেন। তারপর গ্ল্যাক্সোর পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়াতে বলেন।

এতেও কবি কৌতুক করে তাঁর শুশ্রূষাকারিণীদের প্রতিদিনই জিজ্ঞাসা করতেন—আজ আমি ক'মাসের খোকা গো ?

মারের সাবধান নেই

কবি শেষবার পীড়িত হয়ে কলকাতায় এসেছেন।

তাঁর শরীরে অস্ত্রোপচার হবে সব ঠিক।

অস্ত্রোপচারের আগের দিন স্যার নীলরতন সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার জ্যোতিপ্রসাদ সরকার কবিকে দেখতে এসেছেন। অস্ত্রোপচারের সময় ঠিক কিরূপ যন্ত্রণা হতে পারে জ্যোতিবাবু কবিকে তারই আভাস দিলেন। কারণ পূর্বে জানতে পারলে কবি নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারবেন।

জ্যোতিবাবু কবির খুব স্নেহভাজন। তিনি কবিকে বললেন—আশঙ্কার কোন কারণ নেই। যন্ত্রণা নিবারণের সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হবে।

জ্যোতিবাবু কৌতুক করে কবিকে একথাও বললেন—অস্ত্রোপচারের সময় আপনি কিছুই টের পাবেন না। এমন কি সে অবস্থায় আপনি কবিতাও রচনা করতে পাবেন।

শুনে কবি হেসে বললেন—অস্ত্রোপচারের যন্ত্রণা যদি কবিতা রচনার চেয়ে তীব্রতর না হয়, তবে আমি প্রস্তুত। ডাক তোমার সার্জেনকে।

জ্যোতিবাবু বললেন—জানি আপনার যন্ত্রণা হবে না। তবু আমাদের সার্জেনদের কিছু সাবধান হয়ে কাজ করতে হবে। কারণ জানেন তো, সাবধানের মার নেই।

কবি তৎক্ষণাৎ পরিহাস করে উত্তরে বললেন—কিন্তু ভুলে যেও না, মারের সাবধান নেই।